

[মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত
১৮।১০।৫৫ তারিখের নং ৬৬।৫৫ এস ওয়াই এল বিজ্ঞপ্তিপত্র দেখুন]
এবং ২৪.১০.৬৩ তারিখের পত্র অনুযায়ী সংশোধিত ও পরিমার্জিত

ইতিহাস

মধ্য যুগ

পরিমার্জিত পরিবর্ধিত নব পর্যায়

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি.,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ও ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য

এশিয়া
পাবলিশিং কোং

প্রকাশনায়
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে
মালবিকা দত্ত
এশিয়া মুদ্রণী
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

পরিমার্জিত পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ
জানুয়ারী—১৯৬৬

॥ ১·৫৮ ॥

সূচী

১

বর্বর আক্রমণ

রোমসাম্রাজ্যের ও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন

রোমের অন্তিম দশা : রোম নগরীকে ঘিরিয়া রোমসাম্রাজ্যের আশ্রয়ে পরিণতি লাভ করিয়াছিল প্রাচীন ইয়োরোপীয় সভ্যতা। রোমের প্রতাপ ও বৈভব ছিল বিশ্ববিদিত। তার ছায়াতলে বিকশিত হইয়াছিল অপূর্ব স্থাপত্যশিল্প, সুললিত ল্যাটিন সাহিত্য. সমাজবিধায়ক আইনশাস্ত্র ও আনন্দময় নাগরিক জীবন। কিন্তু এমনই ইতিহাসের নিয়ম যে কোন সাম্রাজ্য গৌরবের শিখরে উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পতন আরম্ভ হয়। রোমের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে রোমের বনিয়াদে ফাটল দেখা গেল। বস্তুতঃ একটি নগরের পক্ষে তিন-মহাদেশব্যাপী এই বিরাট সাম্রাজ্য বেশীদিন রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। অবিরাম যুদ্ধে নগরীর যুবশক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। চাষীরা লড়াই করিতে গিয়া অথবা খাজনার চাপে জমি হারাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। তাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিতে লাগিল কিংবা জমিদারের খামারে ভূমিদাস হইয়া কোনমতে জীবনরক্ষা করিল। ক্রীতদাসরা ছিল পশুরও অধম। অথচ তাহাদেরই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের উপর দাঁড়াইয়াছিল রোমের সাম্রাজ্য, সমৃদ্ধি ও সভ্যতা। এদিকে সম্রাট্‌রা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসন বজায় রাখিতে হইত। এজন্য নির্ভর করিতে হইত রাজরক্ষী প্রীটোরীয়ান বাহিনীর উপর। সম্রাটরা ইহাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িলেন। দুর্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রীটোরিয়ানরা অসন্তুষ্ট হইলেই বিদ্রোহ করিয়া

বসিত আর কুচক্রী ক্ষমতালোভীর দল তাহাদিগকে ঘুষ দিয়া কার্যসিদ্ধি করিত।

জার্মান জাতি : রোমসাম্রাজ্যের যখন এরূপ দুরবস্থা তখন উত্তর দিক হইতে দলে দলে আসিল বিদেশী হানাদার। ইহারা জাতিতে ছিল টিউটন বা জার্মান। জার্মানদের কথা জানা যায় সীজার ও ট্যাসিটাসের বিবরণ হইতে। রোমানরা ইহাদিগকে বলিত 'বর্বর'। কিন্তু ইহারা আদৌ অসভ্য বা বর্বর ছিল না। ইহারা আর্যজাতির এক শাখা এবং কথা বলিত আর্যভাষায়। ইহাদের দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত, চুল রক্তিম, চোখ নীল। ইহারা শহর গড়িত না, পাকা বাড়ীতে বাস করিত না। সবুজ মাঠে ও ঝরণার ধারে ছিল ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত গ্রাম, কাঠের কিংবা মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। কাঠের ফ্রেমে মাটি দিয়া, শনের ছাদ লাগাইয়া গড়া হইত ইহাদের ঘর। শিকার, মাছধরা ও পশুপালন ছিল ইহাদের জীবিকা; প্রধান খাদ্য ছিল মাছমাংস, শাকসব্জি ও আপেল। ইহারা পুষিত গরু, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল। কিছু কিছু চাষের কাজও ছিল। ইহারা বলদ দিয়া লাঙল টানাইত আর ঘোড়ায় টানা রথে চড়িয়া বেড়াইত। রথদৌড় ছিল জাতীয় ক্রীড়া। যুদ্ধ ছিল তাহাদের নেশা। কেহ ছিল অশ্বারোহী, কেহ বা পদাতিক। বর্ম পরিয়া ঢাল ও বর্শা কিংবা তলোয়ার হাতে তাহারা যুদ্ধে বাহির হইত। মেয়েরাও ছিল সাহসী। কখনো কখনো তাহারাও যুদ্ধে নামিয়া পড়িত। তাহারা ছিল সতী সাধ্বী এবং পুরুষের শ্রদ্ধার পাত্রী। বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত।

জার্মানদের মধ্যে ছিল বহু উপজাতি। প্রত্যেক উপজাতি ছিল ছোট ছোট যূথ বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যৌথ সভায় সকলে মিলিয়া যূথের কাজকর্ম চালাইত। সকলের উপরে ছিলেন রাজা

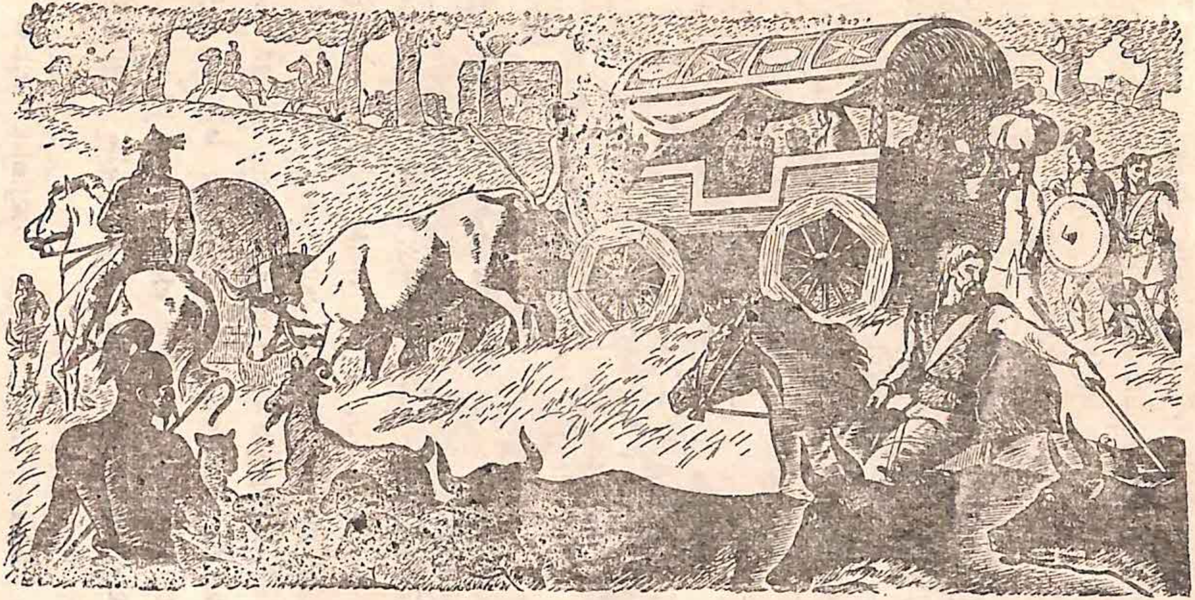

ইয়োরোপে
হূণ ও জার্মান,
ভারতে শ্বেতহূণ
হূণ
তুর্কিস্থান
স্পেন
আফ্রিকা
শ্বেতহূণ
গুপ্ত সাম্রাজ্য
জার্মান অভিযান.......................
হূণ অভিযান.......................

কিংবা সর্দার, তাহার নীচে অভিজাত বা প্রধানগণ, তার পরে সাধারণ লোক, আর নীচে ভূমিদাস। ইহারা অভিজাতদের জমি চাষ করিত।

জার্মান নায়ক ও অনুচরেরা পরস্পরকে ভাই-এর চেয়েও বেশী ভালবাসিত। একবার ডিয়েট্রিশ নামে এক গথ নায়কের সাতজন অনুচর শত্রু এরমেনরিকের হাতে বন্দী হয়। ডিয়েট্রিশ এরমেনরিকের পুত্র ও আঠার শ' লোককে আটক করিয়া ইহাদের বিনিময়ে তাঁহার সাতজন সাথীর মুক্তি ভিক্ষা করিলেন। এরমেনরিক রাজী হইলেন না; অধিকন্তু বলিয়া পাঠাইলেন ডিয়েট্রিশ রাজ্য ছাড়িয়া না গেলে তিনি তাঁহার সাথীদিগকে মারিয়া ফেলিবেন। বিশ্বস্ত অনুচরদের জন্য ডিয়েট্রিশ রাজ্য ছাড়িলেন, তাহাদিগকে লইয়া আবার যাযাবর জীবনে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ একাধিক আনুগত্যের কাহিনী জার্মানরা তাহাদের লোকগাথায় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

রোমানরা যখন বিভেদ ও বিলাসিতায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে তখন জার্মানরা আসিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা লইয়া। রোমের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হইয়া বসবাস তুলিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। স্ত্রীপুত্র এবং গরুবাছুর সঙ্গে লইয়া, ঘোড়ার গাড়ীতে মালপত্র চাপাইয়া তাহারা দলে দলে স্রোতের মত উত্তর দিক হইতে সাম্রাজ্যের ভিতর ঢুকিতে লাগিল।

তখন রোমের নিজস্ব কোনও সেনাবাহিনী অবশিষ্ট নাই যে তাহাদিগকে বাধা দিবে। নিরুপায় হইয়া রোমানরা একদল হানাদারকে ভাড়া করিয়া যুদ্ধে লাগাইত আর একদলের বিরুদ্ধে। ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়া দেশ রক্ষা হয় না, বিশেষতঃ যদি তাহারা আক্রমণকারীদের জ্ঞাতিভাই হয়। অবশেষে বাধ্য হইয়া রোম



জার্মানরা দলে দলে রোমসাম্রাজ্যের ভিতর ঢুকিতে লাগিল।

কয়েকটি জার্মান উপজাতিকে সীমান্ত প্রদেশে বসবাস করিতে দিল।

রোমের বিপদ আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ কনস্টেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্বভাগে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে এই নগরীর নাম হইল কনস্টান্টিনোপ্‌ল্। ৩৩৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইল। পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী রহিল রোম, পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ বা বাইজেন্টিয়াম।



চীনের প্রাচীর

এমন সময় মধ্য এশিয়ার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তভূমিতে এক আলোড়ন উঠিল। এখানে বাস করিত হূণ নামে এক যাযাবর

মঙ্গোলীয় জাতি। ইহারা যখন তখন চীনের শস্যশ্যামল ভূমির উপর হামলা করিয়া লুটপাট করিত। চীন-সম্রাট শি-হোয়াংতি এক প্রকাণ্ড প্রাচীর তুলিয়া উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করিলেন। তাহার পর রাজদণ্ড হাতে লইল পরাক্রান্ত হান বংশ। চীনের প্রাচীরে বাধা পাইয়া এবং হান সম্রাটদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া হূণরা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ তাহারা আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল ইয়োরোপের পূর্ব সীমানায় ডন ও ভল্‌গা নদীর কিনারে। তাহাদের পশ্চিমদিকে ডনের অপর পারে ছিল গথ নামে এক জার্মান উপজাতি। চতুর্থ শতকে এই অঞ্চলে তৃণ ও শস্যের অজন্মা দেখা দিল। যাযাবর হূণরা আবার পশ্চিমদিকে অভিযান শুরু করিল এবং তাহাদের চাপে গথরা উদ্বাস্তু হইয়া রোম সাম্রাজ্যের উপর চড়াও হইল।

রোমের পতন ঃ ইহার পর জার্মান ও হূণরা বন্যার প্লাবনের মত রোমের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমে পশ্চিমদেশীয় গথরা, তারপর ভ্যাণ্ডেলরা, তারপর পূর্বদেশীয় গথরা একে একে আসিয়া সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার করিয়া বসিল। গথরাজ এলারিক রোম আক্রমণ করিলেও লুটপাট করেন নাই বা মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করেন নাই। ভ্যাণ্ডেলরা নির্মমভাবে রোমের উপর ধ্বংসের তাণ্ডব চালাইল। তারপর অবিশ্রাম ধারায় আসিতে লাগিল দলে দলে জার্মান উপজাতি। শেষে অগ্রসর হইল হূণরা। হূণরাজ এটিলার সাম্রাজ্য তখন তুর্কীস্তান হইতে ইয়োরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রচণ্ড যাযাবর বাহিনী লইয়া তিনি উল্কার মত পূর্ব-সাম্রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িলেন। সম্রাটকে বশীভূত করিয়া তিনি গল বা ইটালীর উপর দিয়া প্রলয়ের মত ছুটিয়া গেলেন। তিনি যেখানে যাইতেন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, লুণ্ঠন

ও ধ্বংস চালাইয়া সে স্থানকে শ্মশান করিয়া ফেলিতেন। তিনি নিজেকে বলিতেন 'বিধাতার রোষানল'।

বারবার আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া সম্রাট্ রোম পরিত্যাগ করিলেন, পূর্বদিকে 'রেভেনা'র দুর্গে রাজপাট লইয়া গেলেন। সেখানে ৪৭৬ সালে এক গথ সর্দার সম্রাটকে সরাইয়া পশ্চিম সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল।

হূণজাতিঃ হূণদের নাম শুনিলে রোমানদের মনে আতঙ্ক হইত। তাই তাহারা হূণদিগকে নৃশংস পিশাচের মত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে। তাহারা নরমাংস খাইত, মেয়ে ও শিশুদিগকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিত। এ সমস্ত কথা অতিরঞ্জিত। যাহারা কার্থেজের সঙ্গে বারবার সন্ধিসর্ত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিল, যাহারা যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, যাহারা মানুষ ও বন্যপশুর লড়াই দেখিয়া আমোদ পাইত, শত্রুকে হিংস্র বলা তাহাদের মানায় না।

হূণরা ছিল অশ্বারোহী যাযাবর। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া তাহারা দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। টাট্টু ঘোড়া ও সওয়ার উভয়ই কষ্টসহিষ্ণু। যেখানে আছে চরিবার মাঠ ও প্রচুর ঘাস সেদিকেই তাহাদের গতি। তাহারা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত। যুদ্ধ তাহাদের নেশা, পেশা ও আমোদস্ফূর্তি। বৃদ্ধদের এই দুঃখ ছিল মর্মান্তিক যে তাহারা আর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বা জয়ের গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর সম্রাট্ থিয়োডোসিয়াস হূণরাজ এটিলার হাতে পরাস্ত হইবার পর তাঁহার নিকট কয়েকজন দূত পাঠান। ইহাদের মধ্যে একজনকে সম্রাট্ ভাড়াটিয়া আততায়ী দিয়া এটিলাকে হত্যা করাইতে গোপনে নির্দেশ দিলেন। আততায়ী



হূণরাজ এটিলা

এটিলাকে সব বলিয়া দিল। এটিলা শান্তভাবে যথারীতি উপহার দিয়া দূতদিগকে বিদায় দিলেন। তারপর তিনি থিয়োডোসিয়াসের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। হূণ-দূত কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এ গিয়া বলিল, "থিয়োডোসিয়াস খ্যাতনামা ও সম্ভ্রান্ত পিতামাতার সন্তান। এটিলাও সদ্‌বংশজাত। তিনি তাঁহার কাজে পিতৃসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু থিয়োডোসিয়াস বংশমর্যাদা হারাইয়াছেন, তিনি কর দিতে স্বীকার করিয়া দাসত্বে অবনত হইয়াছেন। তাঁহার উচিত ভাগ্য ও যোগ্যতার বলে যিনি তাঁহার প্রভুর আসনে বসিয়াছেন তাঁহাকে সম্মান করা। তাহা না করিয়া দুরাত্মা ক্রীতদাসদের মত তিনি অবৈধভাবে প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।" এ কথায় কাজ হইল। থিয়োডোসিয়াস বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারই দূতদের মধ্যে একজন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে হূণরা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইলেও চরিত্রে রোমানদের চেয়ে হীন ছিল না।

রোমের শাসনাধীনে ইয়োরোপে ছিল এক রাষ্ট্র। জার্মান ও হূণদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হইল। হানাদাররা এক এক দেশে বসিয়া নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। গথরা বসিল স্পেনে, ফ্রাঙ্করা গল-এ, কতক জার্মান জাতি মধ্য ইয়োরোপে। ইহাদের নাম অনুসারে শেষোক্ত দুই দেশের নাম হইয়াছে ফ্রান্স ও জার্মান। এইরূপে একরাষ্ট্র ইয়োরোপ ভাঙ্গিয়া সৃষ্টি হইল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র। অতীত কীর্তি ও গৌরবের উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু জার্মান জাতির ছিল অপরের সদ্‌গুণ গ্রহণ করিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা। তাহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিল,—রোমের আইন, শাসন প্রণালী, স্থাপত্যবিদ্যা—সব

শিখিয়া লইল। তাহাদের নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নারীর সম্মান ও গণতন্ত্র। জার্মান ও রোম সভ্যতায় এই দুই ধারা মিশিয়া নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ রচিত হইল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঃ রোমসাম্রাজ্যের অন্তিমকালে ভারতবর্ষের গৌরবচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল গুপ্তসাম্রাজ্য। গুপ্তশাসনে প্রায় সারা আর্যাবর্ত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, শান্তি এবং সুশাসনের ছায়ায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রতিভা অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্য ছিল সামাজিক ভেদাভেদ ও আত্মকলহে জর্জরিত। রোমের পতনের সমসময়ে প্রচণ্ড হূণ আক্রমণ আসিয়া পড়িল আর্যাবর্তের উপর। হূণ আক্রমণে ইয়োরোপের আকাশ জুড়িয়া অন্ধকার নামিয়া আসিল। এবার আর্যসভ্যতার মহিমা আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল।

চীনের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া হূণরা যখন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন তাহাদের চাপে মধ্য এশিয়া হইতে শক ও কুষাণরা সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার পর হূণদের এক শাখা গেল পশ্চিমে ইয়োরোপ-সীমান্তে ডন ও ভল্‌গার তীরে, আর এক শাখা রহিল কাস্পিয়ান সাগরের নিকট অক্ষু নদীর উপত্যকায়। শেষোক্ত শাখাকে গ্রীকরা বলিত 'শ্বেত হূণ'। এটিলা ও তাঁহার দুর্দান্ত বাহিনী যখন ইয়োরোপে বিভীষিকা

বিস্তার করিতেছিল তাহার কিছু পরে শ্বেত হূণরা হিন্দুকুশ পার হইয়া গান্ধার দেশে প্রবেশ করিল। পারস্য ও গান্ধার করায়ত্ত কারয়া তাহারা কাশ্মীর জয় করিল এবং ভারতের বিভিন্ন জনপদ আক্রমণ করিয়া কর আদায় করিতে লাগিল। কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজপুতনা এবং উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ জুড়িয়া তোরমান হূণরাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্র মিহিরকুলের রাজধানী ছিল পঞ্জাবের শাকল বা শিয়ালকোট। অমানুষিক বর্বরতার জন্য তিনি কুখ্যাত। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লন, চীন পরিব্রাজক হিউএন সাং, চীন রাজদূত সুংয়ন এবং গ্রীক লেখক কস্‌মাস একবাক্যে মিহিরকুলের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কত মঠ মন্দির বৌদ্ধস্তূপ তিনি ধ্বংস করিয়াছেন, কত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়াছেন, কত জনপদ উৎসন্ন করিয়া নির্দোষ নরনারী হত্যা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কথিত আছে যে পাহাড়ের উপর হইতে হাতী গড়াইয়া দিয়া তিনি মজা দেখিতেন। তাঁহার তামাসাও ছিল এমন নিষ্ঠুর।

হূণরা প্রথমে বাধা পাইল গুপ্ত সম্রাট্‌দের নিকট। সম্রাট্‌ স্কন্দগুপ্তের হাতে তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। তারপর পঞ্চাশ বছর তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিতে সাহস পায় নাই। ইহার পর আসিলেন তোরমান। তাঁহার আক্রমণ কেহ রোধ করিতে পারিল না। কিন্তু মিহিরকুল মালোয়ার রাজা যশোধর্মনের নিকট পরাস্ত হইয়া হটিয়া গেলেন। যশোধর্মনের মৃত্যুর পর তিনি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ কারলেন। সাম্রাজ্য তখন মগধে সীমাবদ্ধ। ইহার রাজা ছিলেন নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য। বালাদিত্যের হাতে মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কিন্তু তিনি মায়ের অনুরোধে এই দুর্দান্ত শত্রুকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ভারতীয় রাজাদের মধ্যে এরূপ আত্মঘাতী উদারতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ইহার পরও হূণরা ক্ষান্ত হয় নাই। কনৌজ ও থানেশ্বরের রাজাদের হাতে আবার তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এমন সময়ে অক্ষু নদীর তীরে তুর্ক ও পারসিকদের মিলিত শক্তি শ্বেত হূণদের কেন্দ্রীয় ঘাটি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিল। ভারত হইতে হূণ বিভীষিকা দূর হইল।

কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য আর টিকিল না। হূণ আক্রমণে ও সামন্ত-বিদ্রোহে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। গুপ্ত-গরিমার সমাধির উপর ছোট ছোট খণ্ডরাজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিলেও হূণরা ভারতীয় সভ্যতার উপর কোন প্রভাব রাখিতে পারিল না। হূণ রাজারা ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করিলেন। জৈনগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তোরমান শেষজীবনে জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মিহিরকুলের ধর্মবোধ ছিল না বটে, কিন্তু তিনি নিজেকে বলিতেন শৈব। তাঁহার মুদ্রায় শিবের ষাঁড় চিত্রিত আছে। ক্রমে ক্রমে হূণরা এদেশের লোকের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মিশিয়া গেল। বহুকাল পরে মধ্যভারতে রাজপুত নামে এক বীর্যবান জাতির উত্থান হয়; শোনা যায় যে হূণ ও দেশীয়দের সংমিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল।



মিহিরকুলের মুদ্রা

কালক্রম

	ইয়োরোপ	ভারত
৩৩৭	সাম্রাজ্য-দ্বি-বিভক্ত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য	
৪০৩	রেভেনায় পাশ্চাত্ত্য রাজধানী	
৪৪১–৪৫২	হূণ আক্রমণ	
৪৬০		স্কন্দগুপ্তের হাতে হূণদের পরাজয়
৪৬০	রোম সম্রাট্‌-বংশ অপসারিত	
৪৮৪		হূণদের পারস্য জয়
৫০০–৫১৫		তোরমান
৫৩০		মিহিরকুল

হূণ ও জার্মান আক্রমণে পশ্চিম-সাম্রাজ্য লুপ্ত হইবার পর রোমের মহিমার উত্তরাধিকারী হইল পূর্ব-সাম্রাজ্য। ইয়োরোপ ও এশিয়ার, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের সঙ্গমে অবস্থিত ছিল ইহার রাজধানী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ বা বাইজেন্টিয়াম। এখান হইতে গ্রীস, মিশর, এশিয়া মাইনর ও সীরিয়া-প্যালেস্টাইন অঞ্চলে শাসন চালাইবার সুবিধা ছিল। জলপথে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাতায়াতও ছিল সহজ। রোমের পতনের পর বাইজেণ্টাইন



সম্রাট জাসটিনিয়ান



সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা

সাম্রাজ্য নানা বিপর্যয়ের মধ্যে আরো প্রায় হাজার বছর টিকিয়া রহিল।

জাস্‌টিনিয়ান : ৫২৭ সালে সম্রাট হইলেন জাস্টিনিয়ান। রোমের গৌরব আবার ফিরাইয়া আনবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সার্থক করিবার জন্য তাঁহার যত্ন ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি রাজকার্যের জন্য দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন।

রাত্রে নিদ্রারও বিশেষ দরকার হইত না। তাঁহার খাদ্যে ও পোশাকে কোন বিলাসিতা ছিল না। এদিক দিয়া তিনি ছিলেন বংশের ব্যতিক্রম।

জাস্টিনিয়ানের প্রধান কীর্তি রোমের আইন সঙ্কলন। সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বহুবিধ আইন প্রণয়ন রোমের এক বিশিষ্ট অবদান। রোমের পতনের পর এই আইনগুলি অচল হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিতে বসিয়াছিল। জাস্টিনিয়ান এগুলি সঙ্কলন করিয়া নিজের সাম্রাজ্যে প্রবর্তন করিলেন। ইয়োরোপীয় দেশগুলির আইন-কানুন অনেকাংশে জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা হইতে গৃহীত। অতঃপর জাস্টিনিয়ান রোমের অনুকরণে কনস্টান্টিনোপ্‌লকে বহু প্রাসাদ, গির্জা ও জলাশয় দ্বারা সুশোভিত করিলেন।

বেলিসেরিয়াস ছিলেন জাস্টিনিয়ানের উপযুক্ত সেনাপতি। তাঁহার উপর পশ্চিমের দেশগুলি জার্মানদের অধিকার হইতে মুক্ত করিবার ভার পড়িল। বেলিসেরিয়াস উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডেল-দিগকে পরাস্ত করিলেন, তারপর একে একে ইটালী ও স্পেনের দক্ষিণ অংশ গথদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও জাস্টিনিয়ান ছিলেন ঈর্ষাকাতর। তিনি এই বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য রণনায়ককে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। কারামুক্ত হইবার পর বেলিসেরিয়াস দারিদ্র্যের মধ্যে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহার পর জাস্টিনিয়ানও আর বেশীদিন বাঁচিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ইটালী আবার জার্মানদের হাতে চলিয়া গেল। পঞ্চাশ বছর পরে হেরাক্লিয়াস নামে আর একজন পরাক্রান্ত সম্রাট

সিংহাসনে বসিলেন। তখন পারসীক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন দ্বিতীয় খসরু। হেরাক্লিয়াসের রাজত্বকাল খসরুর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে কাটিল। অবশেষে খসরু নিনেভার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। গ্রীস দ্বিতীয়বার পারসীক আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইল।

এমন সময়ে ইস্‌লাম ধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া আসিল দুর্ধর্ষ আরব জাতি। সীরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফ্রিকা ও স্পেন ইস্‌লামের অর্ধচন্দ্রে ঢাকিয়া গেল। সাম্রাজ্যের গৌরবরবি অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল।



সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ বাইজেন্টিয়াম ছিল সাম্রাজ্যের প্রাণ-কেন্দ্র। এই নগর তিন দিক সমুদ্র ও এক দিক দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবার পর এখানে শান্তি ও প্রাচুর্যের ক্রোড়ে গ্রীক ও রোমের সভ্যতার সমন্বয় হইল। ইহার বাহন হইল গ্রীক ভাষা ও খ্রীষ্টান ধর্ম। রোমে

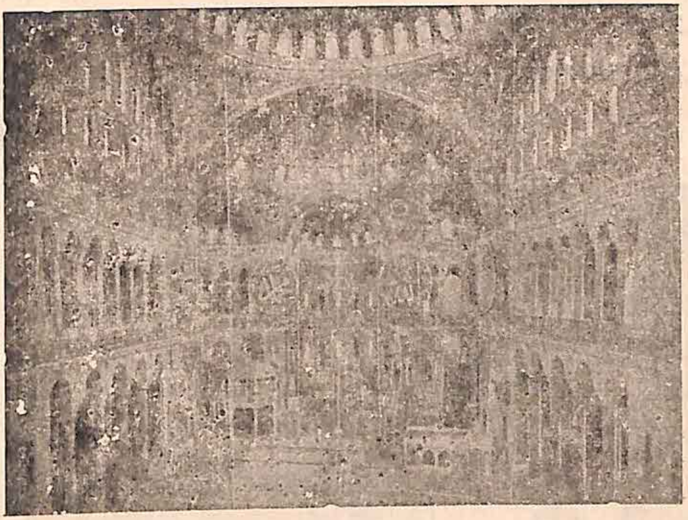
জার্মানদের প্রভাবে পড়িয়া খ্রীষ্টধর্মের কিছু কিছু রূপান্তর হইল। বাইজেন্টিয়ামে গ্রীক যাজকরা রক্ষা করিল খ্রীষ্টধর্মের আদি ও অকৃত্রিম রূপ। এখান হইতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইল রুশ ও প্রাচ্য ইয়োরোপে। রুশের বিরাট প্রান্তরে ও অরণ্যে বাইজেন্টিয়াম হইতে ধর্ম ও সভ্যতার আলো প্রবেশ করিল। এই প্রকারে রোমান সাম্রাজ্যের মত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, পশ্চিমে রোমান ক্যাথলিক চার্চ আর পূর্বে প্রাচীনপন্থী গ্রীক চার্চ।

ঐশ্বর্য-গরিমায় বাইজেন্টিয়াম পূর্ববর্তী রোমের চেয়ে কম ছিল না। রাজসভার জৌলুস ও জাঁকজমক রোমকেও হার মানাইয়া ছিল। সোনার গাছ দিয়া সুসজ্জিত আসর, সেই গাছে মণিমাণিক্যের ফুল, সোনার পাখি। কলের পাখি গান গাহিত, কলের সিংহ গর্জন করিত। রাজা ও সভাসদদের পোশাকের পারিপাট্যে চোখ ধাঁধিয়া যাইত। সভার খুঁটিনাটি আদবকায়দা সম্রাট-সম্রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া পাইক-বরকন্দাজ পর্যন্ত সকলকে মানিয়া চলিতে হইত।

দেশ শাসন করিত আমলারা। বিভিন্ন বিভাগে ছিল অসংখ্য ছোটবড় কর্মচারী। সেনাবিভাগে নাগরিকরা বড় একটা আসিত না। এশিয়াবাসীরা সাম্রাজ্যের ফৌজে নাম লিখাইত, জার্মানরাও আসিয়া ঢুকিত। সমুদ্রপথে শত্রুর আক্রমণ ও জলদস্যুদের দৌরাত্ম রোধ করিবার জন্য ছিল নৌবাহিনী। অতিকায় রণ-তরীগুলিতে দুই সারিতে বসিত একশ' হইতে তিনশ' পর্যন্ত দাঁড়ি। ছোট ছোট ছিপনৌকাগুলি তীরবেগে ছুটিত। পাটাতনের উপর ছিল কামানের মত এক যন্ত্র। ইহার দ্বারা পাথর ও অন্যান্য অস্ত্র শত্রুর উপর বর্ষণ করা হইত। সপ্তম শতক হইতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইল। স্প্রিং-এর নলে বারুদ পুরিয়া জ্বালিয়া দিয়া

স্প্রিং ছাড়িলে শত্রুর উপর বারুদের আগুন গিয়া পড়িত। কখনো বা ধাতুপাত্রে বারুদ পুরিয়া যোদ্ধারা হাতবোমার মত ছুঁড়িয়া মারিত। এই ভীষণ মারণাস্ত্রকে বলিত 'গ্রীক অগ্নি'।

ঘোড়ার রথের দৌড়-প্রতিযোগিতা ছিল প্রধান খেলা। হিপোড্রাম নামক ক্রীড়াক্ষেত্রে শহর ভাঙিয়া লোক আসিত এই



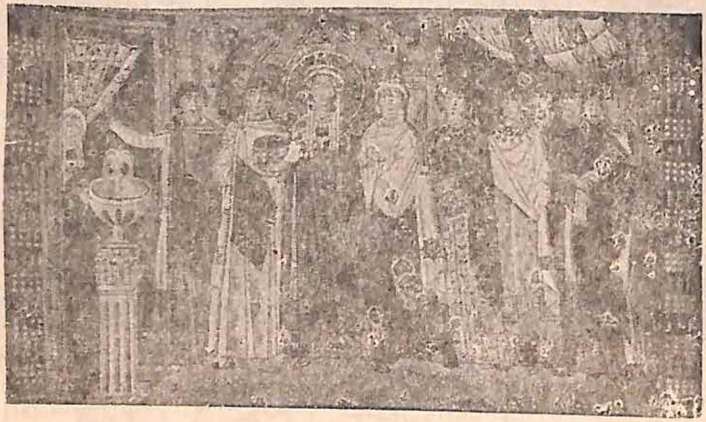
সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা—অভ্যন্তরের দৃশ্য

খেলা দেখিতে। ইহার নেশা ছিল মারাত্মক। চারজন রথীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। নাগরিকরা নীল, সবুজ, লাল বা সাদা ব্যাজ পরিয়া এক এক রথীর পক্ষ লইত। খেলার হারজিত লইয়া দলাদলি ও মারদাঙ্গাও কম হইত না।

রোমের মত বাইজেন্টিয়ামেও সম্রাট্‌রা বহু সুন্দর প্রাসাদ, জলাশয়, সেতু, দুর্গ, গির্জা ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন

সেন্ট সোফিয়ার গির্জা স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। ইহা জাস্টিনিয়ানের অদ্বিতীয় কীর্তি। স্নানাগারগুলি ছিল নগরের বিলাসিতা। এখানে দাসরা প্রভুদের দেহ সাবান দিয়া ঘষিয়া মুছিয়া দিত। প্রভুরা বিশ্রাম ও আরাম করিয়া ঘরে ফিরিত।

চারুকলার মধ্যে রঙিন মিনাকরা চিত্র ছিল অগ্রগণ্য। রঙ্-বেরঙের কাঁচ, পাথর কিংবা ধাতুর পাত জোড়া দিয়া আঁকা ছবি বাইজেন্টাইন চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। সোনারূপার এবং এনামেলের কারুকার্যেও শিল্পীরা হাত পাকাইয়াছিল। সুতা ও রেশমের মিহি কাপড় বুনিয়া শিল্পীরা তাহার উপর সূচের কাজ করিত। কি



জাস্টিনিয়ানের মহিষী থিয়োডোরা—মিনাচিত্র

স্থাপত্যে, কি চিত্রে বা কারুশিল্পে সহজ সরল সৌন্দর্যের প্রতি শিল্পীর নজর ছিল না, তাহার লক্ষ্য ছিল ঐশ্বর্য ও চাকচিক্য দিয়া চমক লাগাইবার দিকে।

বাইজেন্টিয়ামের বহির্বাণিজ্য ছিল সুদূর-প্রসারিত। কৃষ্ণ সাগরের উপকূল হইতে আসিত দাস, শস্য ও পশুচর্ম। আবিসিনিয়া

হইতে আসিত নিগ্রো দাস, হাতির দাঁত, সোনা, মাণিক। চীন পাঠাইত দামী রেশমের কাপড়। ভারত ও সিংহল পাঠাইত খাওয়ার মশলা, গন্ধদ্রব্য, দামী পাথর। বাইজেন্টিয়াম এই সব দেশে রপ্তানি করিত কাঁচের ও এনামেলের জিনিস এবং তাহার শিল্পপণ্য—বাকি দেনা সোনা পাঠাইয়া শোধ করিত।

জাস্টিনিয়ানের সময় চীন হইতে ইয়োরোপে রেশমশিল্পের আমদানি হয়। চীন রেশমের গুটিপোকার চাষ করিত। রেশমের ব্যবসায়ে ছিল প্রচুর লাভ। এই পোকা চীন কাহাকেও বাহিরে লইয়া যাইতে দিত না। একবার কয়েকজন সন্ন্যাসী একটি নলের মধ্যে কয়েকটি গুটিপোকার ডিম চুরি করিয়া বাইজেন্টিয়ামে লইয়া আসিল। তারপর সেখানে গুটিপোকার চাষ হইল এবং রেশমশিল্প গড়িয়া উঠিল।

বিপুল বৈভব এবং চাকচিক্যের মধ্যেও বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যে দৈন্য ও জরার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধনীদের বিলাসপণ্য জোগাইবার জন্য দেশের সোনা জাহাজে বোঝাই হইয়া এশিয়ায় চলিয়া যাইত। গির্জা ও প্রাসাদ বানাইতে রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না। দেশরক্ষার জন্য নির্ভর করিতে হইত বিদেশী সেনার উপর। শত্রুর আক্রমণের বিরাম ছিল না। পারসীকদের পর আসিল আরব; তারপর তুর্করা। এদিকে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ লাগিয়াই ছিল। সামন্ত রাজারা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের সম্রাট হইবার বাসনা জন্মিত। বহিরাক্রমণ ও অন্তর্যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন কমিতে লাগিল। এই প্রকারে ধীরে ধীরে জীর্ণ পূর্বসাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর আর্যাবর্তে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। প্রায় একশ' বছর পরে হর্ষবর্ধন ইহাদিগকে একত্র করিয়া আবার একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া রাজা হর্ষ সমস্ত গঙ্গা উপত্যকা জুড়িয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন। ইহার উত্তরে ছিল সিন্ধুনদের শতদ্রু শাখা ও হিমালয় পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্মদা নদী ও পশ্চিমে আরব সাগর। পঞ্জাব সিন্ধু ও রাজপুতনার প্রান্তর ছাড়া সমস্ত উত্তর ভারত আবার এক শাসনসূত্রে গ্রথিত হইল।

হর্ষবর্ধন ঃ থানেশ্বর, কনৌজ, গৌড় ও মালব,—আর্যাবর্তে পাশাপাশি চারটি রাজ্য। থানেশ্বরের রাজা, প্রভাকরবর্ধন কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন কনৌজরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে। কনৌজ ছিল গৌড় ও মালবের প্রতিবেশী। প্রভাকরের মৃত্যুর পর গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ও মালবের রাজা দেবগুপ্ত মিলিয়া কনৌজ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মার মৃত্যু হইল আর তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রী শশাঙ্কের হাতে বন্দী হইলেন। থানেশ্বরের যুবরাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন বটে কিন্তু ভগিনীকে মুক্ত করিতে গিয়া শশাঙ্কের হাতে প্রাণ দিলেন।

এই দুর্দিনে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসিলেন রাজ্যবর্ধনের ভাই ষোল বছর বয়সের কিশোর হর্ষবর্ধন। পিতার ও ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য কাঁদিবার সময় নাই। থানেশ্বর ও কনৌজ,—দুই রাজ্যের দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। বিধবা ভগিনী শত্রুর হাতে বন্দী। মালব ও গৌড়ের মিলিত শক্তির সামনে ক্ষুদ্র থানেশ্বর রাজ্য বিপন্ন।

বুদ্ধি, সাহস ও শৌর্যের বলে হর্ষবর্ধন সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিলেন। তিনি রাজ্যশ্রীকে শশাঙ্কের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন, কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্য যুক্ত করিয়া রাজধানী কনৌজে লইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে মালবরাজ পরাস্ত হইলেন। ক্রমে সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সাম্রাজ্য গঠন করিয়া হর্ষবর্ধন 'শিলাদিত্য' উপাধি ধারণ করিলেন।



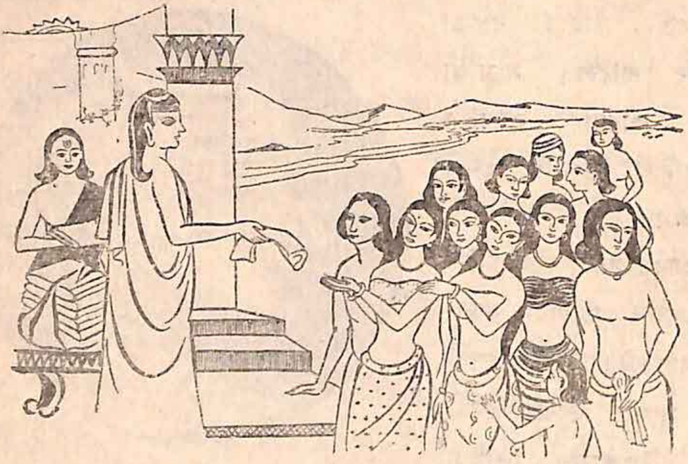
হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য

হর্ষবর্ধনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাঁহার সভা-কবি বাণভট্ট। ইনি কাদম্বরী নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সুন্দর উপন্যাসও লিখিয়া ছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কালে হিউএন সাং নামে এক চীন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন। তিনি হর্ষ ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

হর্ষবর্ধন কেবল যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে পটু ছিলেন না। প্রজামঙ্গলের জন্য ত্যাগ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অশোকের পরই তাঁহার স্থান। অশোকের মত তিনিও দিবারাত্র প্রজাদের কল্যাণের কথা ভাবিতেন। এক মুহূর্ত বিশ্রাম ছিল না। তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেন, কোথাও অত্যাচার বা কুশাসন আছে কি না। হর্ষ প্রথমে শৈব ছিলেন। পরে অশোকের মত তাঁহারও বৌদ্ধধর্মের প্রতি টান হয়। কিন্তু হর্ষ সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করিতেন। তিনি কনৌজে একটি ধর্মসভা ডাকিয়াছিলেন। এখানে

বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল ধর্মের পণ্ডিতেরা আসিয়া আলোচনা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু শীলভদ্র ছিলেন সভাপতি আর হিউএন সাং ছিলেন প্রধান বক্তা।

ইহাতেও হর্ষবর্ধনের তৃপ্তি হইল না। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর



প্রয়াগের সেবায় হর্ষের দান

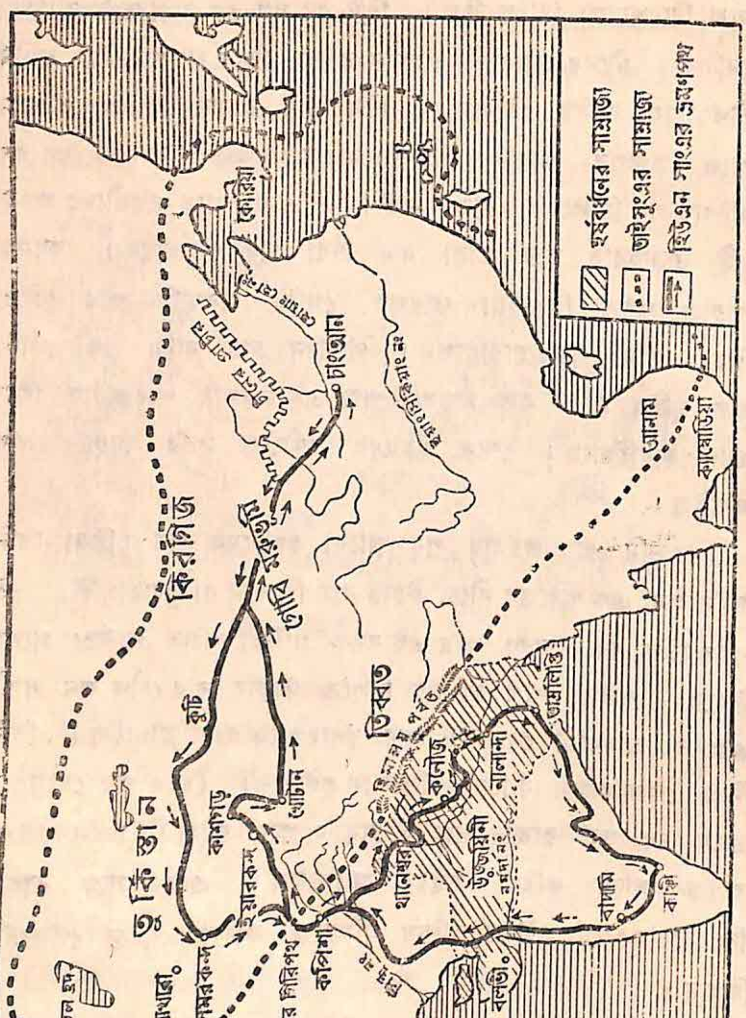
তিনি প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে এক মেলা বসাইতেন। এখানে আসিয়া তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন,—তারপর নিজের যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া ফকির হইতেন। রাজপোশাক, অলঙ্কার পর্যন্ত বাকি রাখিতেন না। দীন দরিদ্রের বেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার তিনি রাজকাজে বসিতেন।

হিউএন সাং-এর তীর্থযাত্রা: এসব কথা লেখা আছে চীন পরিব্রাজক হিউএন সাং-এর ভ্রমণ-কাহিনীতে। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ, এদেশে আসিয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধের বাণী ভাল করিয়া জানিতে ও শিখিতে। ষোল বছর ধরিয়া বিদেশে ঘুরিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। সে এক উপন্যাসের মত কাহিনী। সে সময়ে চীন

দেশে বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। হিউ-এন সাং-এর বয়স তখন আঠাশ-উনত্রিশ। চীনের রাজধানী চাংআন হইতে তিনি পায়ে হাঁটিয়া সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। তিন চার হাজার মাইল পশ্চিমে গেলে তারপর আবার পাঁচশ' মাইল দক্ষিণে ভারতে প্রবেশ করিবার পথ মিলিবে। রাস্তা নাই। যা'ও বা আছে প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তাহা বাদ দিয়া চলিতে হইবে। অনেক পাহাড় পর্বত ডিঙাইয়া তারপর গোবি মরুভূমি পার হইতে গিয়া তিনি পথ হারাইলেন। পাঁচদিন চার রাত্রি এক ফোঁটা জল জুটিল না। কত মানুষ ও পশু এই মরুভূমি পার হইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে! শেষে ইহাদের কঙ্কালের সারি তাঁহাকে পথ দেখাইল।

মরুভূমি পার হইবার পর আরো বহুদিনের পথ চলিয়া তিনি আসিলেন এক পর্বতের নীচে, ইহার নাম পিংশান বা তুষারগিরি। এই পর্বত ছিল বরফে ঢাকা আর এই বরফ গলিয়া পড়িত পার্বত্য পথের উপরে। পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে তাঁহার বার চৌদ্দ জন সাথী এবং বহু ভারবাহী ঘোড়া ও বলদ তুষারপাতে প্রাণ হারাইল। তিনি নিজে কোন রকমে বাঁচিয়া পর্বত পার হইলেন। ইহার পর সৌভাগ্য-ক্রমে এক তুর্ক রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি হিউএন সাংকে আদর করিয়া লইয়া আসিলেন। এবং সঙ্গে প্রহরী দিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কপিশা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন।

তুর্ক রাজার দেশ ছাড়িয়া হিউএন সাং পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে আসিলেন সমরখন্দ নামক এক নগরে। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি আশেপাশের অনেক খবর সংগ্রহ করিলেন। সমরখন্দ তখন ছিল মস্ত একটা হাটবাজারের জায়গা। ভারতবর্ষ


হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
তাইসুং-এর সাম্রাজ্য
হিউএন সাংএর ভ্রমণপথ
কোরিয়া
চাংআন
কিরঘিজ
গোবি মরুভূমি
তিব্বত
তু র্কি স্তা ন
কাশগড়
খোটান
সমরকন্দ
বোখারা
কপিশা
খাইবার গিরিপথ
থানেশ্বর
কনৌজ
নালন্দা
উজ্জয়িনী
বলভী
বাদামি
কাঞ্চী
তাম্রলিপ্ত
আনাম
কাম্বোডিয়া
আরল হ্রদ

তুর্কীস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশের বণিকরা এখানে আসিয়া তাহাদের মাল বেচিত ও সওদা করিত। এখানে ছিল নানারকমের ওস্তাদ কারিগর, এখানকার হাটে মিলিত সুন্দর আরবী ও তুর্ক ঘোড়া।

ইহার পর হিউএন সাং কপিশা হইতে ভারতে প্রবেশ করিলেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আবার এই দীর্ঘ পথ চলিয়া ষোল বছর পরে হিউএন সাং দেশে ফিরিলেন। সঙ্গে আনিলেন ত্রিপিটকের পুথি, যাহাতে ভিক্ষুরা বুদ্ধের পবিত্র বাণী লিখিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আদর দেখে কে? মানুষ কি এমন অসম সাহস, ধৈর্য ও নিষ্ঠার পুরস্কার না দিয়া পারে?

হিউএন সাং-এর বিবরণ: চৌদ্দ বছর ধরিয়া হিউএন সাং সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। নেপাল হইতে কাঞ্চী, গান্ধার হইতে বঙ্গ কোন দেশ বাদ দেন নাই। তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এইসব দেশের কথা লেখা আছে।

হূণ আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলে অনেক প্রাচীন নগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যেমন পাটলীপুত্র, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলবস্তু। আবার অনেক নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন কনৌজ, প্রয়াগ, নালন্দা, মথুরা, থানেশ্বর, ময়ুর (হরিদ্বার), বারাণসী, তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন। ইহা ছাড়া আরো অনেক জনবহুল শহর ও গ্রামের কথা হিউএন সাং লিখিয়াছেন। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ ও কান্যকুব্জ। প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত এই নগর ছিল লম্বায় পাঁচ মাইল, চওড়ায় সওয়া মাইল। নাগরিকরা ছিল বিত্তশালী। তাহারা দামী রেশমের পোশাক ও অলঙ্কার পরিত। নগরে ছিল বড় বড় প্রাসাদ, সুন্দর বাগান ও স্বচ্ছ দীঘি। বিদেশ হইতে অনেক সখের জিনিস আনিয়া ইহাকে সাজান হইয়াছিল। আফগানিস্তান, তুর্কীস্তান, চীন,

সিংহল ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতীয় বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। ইহাদের সঙ্গে ভারতীয় রাজারা দূত বিনিময় করিতেন।

হিউএন সাং এদেশে ঘুরিয়া ভারতবাসীদের চরিত্রের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে একটু অস্থিরমতি হইলেও ইহারা সৎ। ইহারা লোককে ঠকাইতে জানে না এবং কথা দিলে কথার খেলাপ করে না। ইহারা বিশ্বাস করে যে অন্যায় কাজ করিলে পরলোকে শাস্তি পাইতে হইবে।

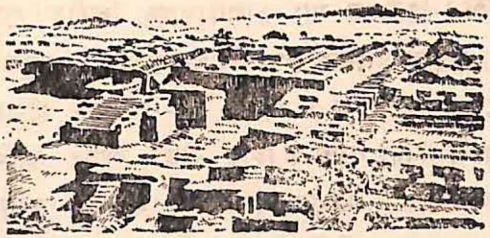

হিউএন সাং

কিন্তু সমাজে ভাগাভাগি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ওবৌদ্ধরা অনেক শাখা প্রশাখায় ভাগ হইয়া গিয়াছিল। আসল ধর্মাচরণের চেয়ে জাত বিচার ও তর্কাতর্কির দিকেই নজর ছিল বেশী। মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তাহাদের শাস্ত্র পড়া বারণ ছিল। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত না। কখনো কখনো তাহাদিগকে মৃত স্বামীর চিতায় উঠিয়া সহমরণে যাইতে হইত।

সকলের নীচে ছিল চণ্ডাল অস্পৃশ্যের দল,—কসাই, জেলে, নট-নটী, ঘাতক, মেথর ইত্যাদি। ইহাদের আস্তানা ছিল শহর ও গ্রামের বাহিরে। ইহাদের ঘরবাড়ির উপর সতর্ক-চিহ্ন আঁকা —যেন কোন ভদ্রলোক এখানে না আসিয়া পড়ে। পথে-ঘাটে বাহির হইলে চলিতে হইত বাঁদিকে ঘেঁষিয়া,—যেন কাহারও ছোঁয়া না লাগে। মানুষকে এত অপমান করিয়া কোন সভ্যতা

বাঁচিতে পারে না। এই পাপের শাস্তি পরে ভারতবাসীকে পাইতে হইয়াছিল।

নালন্দাঃ হিউএন সাং-এর বিবরণীর মধ্যে নালন্দার কথা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গান্ধার দেশে তক্ষশিলা, হর্ষবর্ধনের সময়ে ছিল যেমন বিহারের নালন্দা। দেশ বিদেশ হইতে প্রায় দশ হাজার ছাত্র



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

আসিয়া এখানে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করিত। ক্লাসঘর, পাঠাগার, মানমন্দির, শয়নঘর প্রভৃতি সবকিছুর আলাদা বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকরা এক সঙ্গে বিদ্যালয়ে বাস করিতেন। কাহাকেও বেতন দিতে হইত না। রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের দান হইতে সমস্ত খরচ চলিত।

এখানকার শিক্ষার মান এত উঁচু ছিল যে অনেককেই নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত। যাঁহারা জ্ঞানবিদ্যায় অনেক দূর অগ্রসর কেবল তাঁহারাই ভর্তি হইতে পারিতেন, প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা বিশ-ত্রিশ জনের বেশী নয়। ছাত্রদিগকে ভিক্ষুর সংযম পালন করিতে হইত, নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। দিবারাত্রি বিদ্যাভাস ও আলোচনা চলিত, বড়রা ছোটদের সাহায্য করিতেন।

এজন্য ভারতবর্ষের বাহিরে চীন, পারস্য, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে মনীষীরা তাঁহাদের মনের দ্বন্দ্ব দূর করিবার জন্য এখানে আসিতেন। নালন্দার উপাধির ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি,—সেই উপাধি ও খ্যাতি লইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিতেন। এখানকার অধ্যাপকদের সুনাম ও সম্মান ছিল দেশ-দেশান্তরে। হিউএন সাং কিছুদিন এখানে অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করেন। বাঙ্গালী ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন ইহার অধ্যক্ষ।

দাক্ষিণাত্যঃ হিউএন সাং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। চালুক্যরাজ্য ছিল নর্মদার দক্ষিণে। হর্ষবর্ধন এ রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই—দ্বিতীয় পুলকেশী নর্মদা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে গুজরাট, মালব, কঙ্কন ও মহীশূর জুড়িয়া তাঁহার রাজত্ব বিস্তার করেন। হিউএন সাং তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল সমরপ্রিয় ও উদ্ধত, শত্রুর প্রতি কঠোর কিন্তু বিপন্নের প্রতি সদয়। তাহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজা পুলকেশী প্রতিবেশী রাজাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু তিনি সুশাসক ছিলেন এবং সামন্ত রাজারা তাঁহার অনুগত ছিল। চালুক্যদের রাজধানী ছিল বাদামি। ইহার পরিধি ছিল ছয় মাইল। চালুক্য রাজারা এখানে পাহাড়ের গুহায় সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় লকেশী হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিলেও শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। সুদূর দক্ষিণের পহ্লব রাজা নরসিংহবর্মণের হাতে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। নরসিংহও এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি নালন্দার দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলিকে নিজ অধিকারে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার

রাজধানী ছিল কাঞ্চী। কাঞ্চীর দক্ষিণে মহামল্লপুরম নামক জায়গায় সমুদ্রতীরে পহ্লব রাজারা পাহাড় কাটাইয়া সুন্দর সুন্দর রথ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

চীনের স্বর্ণযুগ ঃ হিউএন সাং যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁহার নিজের দেশে টাং বংশের রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। ৬১৮ হইতে ৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন শ' বছর ধরিয়া এই বংশের রাজত্ব চলে। ইহাদের আগে চীন সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তার উপর তাতার ও অন্যান্য বিদেশীরা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে এবং ফা-হিয়েন ত্রিপিটকের পুঁথির সন্ধানে ভারতবর্ষে আসেন।

টাং বংশের রাজারা বিদেশীদিগকে তাড়াইলেন, চীনে ঐক্য ফিরাইয়া আনিলেন। ঐক্য, শান্তি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য টাং যুগকে 'চীনের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা তাইসুং (৬২৭—৬৫০) ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাঁহার অতুলনীয় কীর্তির জন্য তাঁহাকে বলা হইত "মিং হুয়াং" বা গৌরবময় সম্রাট্। তাতারদিগকে তাড়াইয়া চীনের ঐক্য স্থাপন প্রধানতঃ তাঁহারই কাজ। তুর্কীস্থান, তিব্বত, আনাম ও কিরগিজ প্রান্তর জুড়িয়া তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার পুত্র কোরিয়া জয় করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত করেন। পৃথিবীর মধ্যে টাং সাম্রাজ্যই ছিল তখন সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী।

এই সময়ে চীনে নানা দেশের নানা ধর্মের লোক আসিত। মুসলিম, খ্রীষ্টান ও জরথুষ্টিয়রা আসিয়া অবাধে ধর্মপ্রচার করিত। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদ তাই-সুংএর কাছে ধর্মদূত প্রেরণ করেন এবং তাই-সুং আরব মুসলমানদিগকে ক্যাণ্টন শহরে মস্‌জিদ গড়িবার অনুমতি দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন মসজিদের

মধ্যে ইহা একটি। খ্রীষ্টানরাও তাঁহার কাছে আসিল। তাই-সুং চীনা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করাইয়া পাঠ কারলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া একটি গির্জা ও মঠ স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। আরব মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হইয়া ইরানীরা আসিল সাহায্যের জন্য। জাপানীরা আসিয়া চীনের সভ্যতা গ্রহণ করিল এবং নিজেদের দেশে ইহার প্রচলন করিল। কিন্তু চীনে ভারতীয়দের আনাগোনা এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

টাং আমলে চীনের আইন-কানুন সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। একদিন তাই-সুং রাজধানীতে জেল পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে ২৯০ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে তিনি চাষের কাজে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা কথা দিল যে কাজের শেষে ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেকেই কথামত ফিরিয়া আসিল। তাই-সুং সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে মুক্তি দিলেন। তিনি আরও নিয়ম করিলেন যে ভবিষ্যতে কাহাকেও প্রাণদণ্ড দিতে হইলে তাহার পূর্বে সম্রাট তিনদিন অনশন করিবেন। তাহা হইলে কেহ অন্যায় ভাবে দণ্ডিত হইবে না।

স্বর্ণযুগে চীন ধনধান্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। দেশে খাদ্যের অভাব ছিল না। ঘরবাড়ি ছিল সুন্দর ও আরামদায়ক। লোকে রেশম পশমের বোনা এবং সুন্দর কাজ করা পোশাক পরিত, চা খাওয়া খুব চলিত। দেশ শাসন করিত আমলারা। তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিয়া তবে সরকারী চাকুরিতে ঢুকিতে পারিত। বণিকদের জাহাজ ভারত মহাসাগরে ও পারস্য উপসাগরে যাইত মাল কেনাবেচা করিতে। মালপত্র লেনদেনের সঙ্গে চলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনিময়। হিউএন সাং যেমন ভারতবর্ষে আসিয়া-

ছিলেন, তেমন ভারত হইতে অনেক ভিক্ষু চীনে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

টাং যুগ জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার জন্যও স্মরণীয়। এই সময় পৃথিবীর প্রথম ছাপাখানা চীনে স্থাপিত হয়। বারুদ ও কাগজের মুদ্রার আবিষ্কারও এ যুগের কীর্তি। আমলাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হয় প্রসিদ্ধ হান্‌লিন্ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে পুরাতন তথ্য ঘাঁটিয়া চীনের ইতিহাস লেখা হইত এবং প্রাচীন পুঁথি শুদ্ধভাবে নকল ও সম্পাদনা করিয়া বাহির করা হইত। একটি বিরাট সরকারী গ্রন্থাগারে হাজার হাজার দুর্মূল্য পুঁথি ও কেতাব সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। কাব্যের দিক দিয়া এ যুগের তুলনা নাই। একালের বহু যশস্বী কবির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন লি-পো। তাঁহার



টাং যুগের মৃৎশিল্প—

কবিতায় স্বর্গের সুধা ঝরিয়া পড়িত, তাই তাঁহাকে লোকে বলিত 'স্বর্গহারা দেবদূত'।

মূর্তিশিল্পে ও চিত্রে টাং যুগ চীনের ইতিহাসে শীর্ষস্থানীয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি আগের মত প্রাণহীন নয়, তাহাতে মানুষের দয়ামায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ তাও-ৎসে এ যুগের শিল্পী, তাঁহার চিত্ররীতির প্রভাব চীন ও জাপানের চিত্রকলায় এখনও লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের চিত্র অধিকাংশই ধর্মঘেঁষা। তবে অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও আছে।

মৃৎপাত্রের গড়নের অনেক উন্নতি দেখা যায়। পালিশের কাজে এবং পালিশে রং দিতে ও নকশা আঁকিতে মৃৎশিল্পীরা ছিল সিদ্ধহস্ত। হাতির দাঁতের ও মণিমাণিক্যের সূক্ষ্ম কাজেও এ যুগের শিল্পীরা অগ্রসর হইয়াছিল।

কালক্রম

চীন		ভারত
টাং বংশ আরম্ভ	৬১৮	৬ হর্ষের সিংহাসনে আরোহণ
তাই-সুংএর সিংহাসনে আরোহণ	৬২৭	১০ ২য় পুলকেশীর সিংহাসনে আরোহণ
হিউএন সাংএর ভারত যাত্রা	৬২৮	
		৩০ হিউএন সাংএর ভারতে আগমন
হিউএন সাংএর চীনে প্রত্যাবর্তন	৬৪৫	৪২ ২য় পুলকেশীর মৃত্যু
তাং-সুংএর মৃত্যু	৬৫০	৪৩ কনৌজে ধর্মসভা
		৪৭ হর্ষের মৃত্যু

অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতীয়রা শুধু দেশে বসিয়া শাস্ত্রচর্চা, চাষবাস অথবা কারিগরি কাজ করিত, বাহিরের দুনিয়ার ধার ধারিত না। এ ধারণা ভুল। ভারতীয়রা কূপমণ্ডুক ছিল না। তাহারা সমসাময়িক জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিত। অবশ্য তখন আজকালকার মত যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে সময় লাগিত অনেক আর বিপদও ছিল খুব। কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীরা হটে নাই। তাহারা গরুর গাড়ি করিয়া অথবা পায়ে হাঁটিয়া দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইত কিংবা বড় বড় সওদাগরী নৌকা করিয়া অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাইত।

সিন্ধু সভ্যতার আগে হইতেই ভারতীয়রা সমুদ্রে নৌকা বাহিতে শিখিয়াছিল। তারপর তাহারা সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। সওদাগররা নিজেদের পণ্য নৌকায় বোঝাই করিয়া বিদেশে লইয়া যাইত,—সে দেশের হাটে বেচিয়া সেখানকার মাল কিনিয়া দেশে ফিরিত, দেশে হাট বাজারে তাহা বিক্রয় করিত। আবার কখনও কখনও এক দেশের লোকজন বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাহির হইত। হয়ত' কোথাও অনাবৃষ্টিতে কিংবা দস্যুর দৌরাত্ম্যে দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কিংবা রাজার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তখন দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে ভাগ্যের সন্ধানে—বিদেশে গিয়া ঘর-সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য জগৎ ঃ পাঁচ হাজার বছর আগে হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়োর অধিবাসীরা ব্যাবিলন পর্যন্ত মাল লইয়া যাইত। বৈদিক যুগের আর্যরাও নৌ-বিদ্যায় কম দক্ষ ছিল না। তাহারা ব্যাবিলনে মাল বেচিত, সওদা করিত। আফগানিস্তান ত' বলিতে গেলে আর্যদেরই দেশ। তাহার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নাম ছিল গান্ধার। আফগানিস্তান ও ব্যাবিলনের মাঝখানে স্থলপথে ও জলপথে যত দেশ পড়ে সর্বত্র আর্যরা কারবার চালাইত,—যেমন বেলুচিস্তান, পারস্য, আরব। দাক্ষিণাত্যের অনার্যরা সমুদ্রযাত্রায় ছিল আরো পাকা। তাহারা সমুদ্রতীরের কোন সভ্যদেশে নোঙর ফেলিতে বাকি রাখে নাই।

ক্রমে নাবিকরা আগাইয়া গেল আরও পশ্চিমে—তুর্কী, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, একের পর এক। সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচার করিবার জন্য এসব দেশে দূত পাঠায়াছিলেন। কুষাণদের সময়ে ভারতীয় বণিকরা গেল রোমসাম্রাজ্য পর্যন্ত। তখন আরবরা ছিল পাকা নাবিক এবং উদ্যোগী জাতি। তাহারা ছিল ভারতবর্ষ ও রোমসাম্রাজ্যের যোগসূত্র। তাহারা এই দুই দেশের মধ্যে কেবল মালপত্রের কারবার করিত না। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা লইয়া তাহারা গ্রীক ও রোমের পণ্ডিতসমাজে হাজির করিত।

তুর্কীস্তান, তিব্বত, চীন ও জাপান ঃ উত্তর দিকে আর্যরা পাহাড় ডিঙাইয়া তুর্কীস্তান, তিব্বত ও চীন পর্যন্ত গিয়া ব্যবসা, বসবাস ও ধর্মপ্রচার করিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে ভারতীয়রা মধ্য এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানকার দুর্দান্ত যাযাবর জাতিগুলিকে পোষ মানাইল। গোবির বিস্তীর্ণ বালুরাশির বহু বৌদ্ধ জনপদ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মনীষী অরেল স্টীন ইহার কিছু স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। তুর্কীস্তানে বালুর তল হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন মঠ, মন্দির, মূর্তি, স্তূপ, চিত্র ও ভারতীয় পুঁথি। দু'টি সুন্দর শহরও বাহির হইয়াছে,—কুচি ও খোটান। ফা-হিয়েন ও হিউএন সাং তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ অঞ্চলের বহু বৌদ্ধ উপনিবেশের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

চীনের সঙ্গে ভারতে আত্মীয়তা আরও নিকট। ভারতবর্ষের, শিল্পপণ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশ গেল বৌদ্ধধর্ম। চীনের মঠ, আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিতে লাগিলেন ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষ হইতেও অনেকে গেলেন সেখানে। চীন হইতে আসিলেন ফা-হিয়েন, হিউএন সাং, ইৎ-সিং ইত্যাদি। ভারতবর্ষ হইতে গেলেন গোহরণ, কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরক্ষিত ইত্যাদি। চীনের পথ দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিল কোরিয়ায় ও জাপানে।

হর্ষবর্ধনের সময়ে তিব্বতের রাজা ছিলেন স্রং-সান গাম্পো। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন করিলেন। তিব্বতের লামারা নালন্দায় ও বিক্রমশীলায় আসিয়া বিদ্যাভ্যাস ও ধর্মচর্চা করিতেন আর ভারতীয় ভিক্ষুদিগকে নিজেদের দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। ৯৮০ সালে বাঙালী ভিক্ষু দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও মঠের অনেক সংস্কার করেন। এখানে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে। আজকাল রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ির দিনেও তিব্বত যাওয়া সহজ কথা নয়।

জাপানে ভারতীয়দের এত ঘন ঘন যাতায়াত ছিল না। তবে সেখানেও একটি মন্দিরে ভারতীয় লিপি পাওয়া গিয়াছে। বোধিসেন নামে একজন ভিক্ষু জাপানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যুত্তেৎসু নামে একজন গন্ধর্ব সেখানকার বিদ্যাপীঠে গিয়া নাচগান শিখাইয়া আসেন। জাপানে এখনও বোধিসত্ত্ব ও ভৈরো নামে দু'টি ভারতীয় গানের সুর প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আর্যাবর্তের লোকেরা বলিত সুবর্ণভূমি। মাল বেচিয়া এখান হইতে প্রচুর সোনা লইয়া আসিত, তাই এ নাম। ইন্দোচীনে ছিল দুইটি সুন্দর হিন্দুরাজ্য, চম্পা ও কম্বোজ। কম্বোজ হইতে পরে নাম হইয়াছে ক্যাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ হইতে জাভা, সুবর্ণ হইতে সুমাত্রা, ব্রহ্ম হইতে বর্মা, বালি দ্বীপের নাম বদলায় নাই। এই নাম হইতেই বোঝা যায় যে ভারতীয়রা আসিয়া এইসব দেশকে আপনার করিয়া ফেলিয়াছিল আর এখানে রাজ্য গড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ও শৈব রাজাদের অনেক কীর্তির কথা এসব দেশের পুঁথিতে পাওয়া যায়।

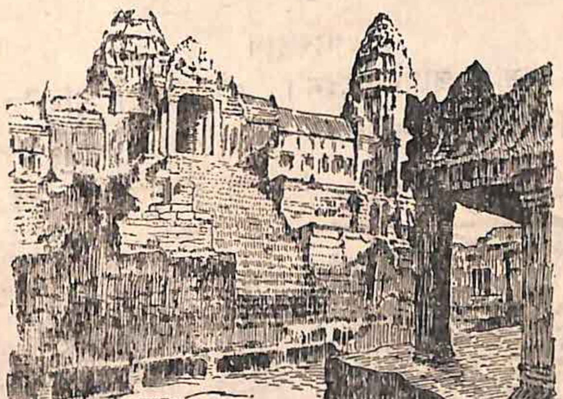
ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ হইতে প্রায় সাতশ' বছর ছিল কম্বোজের গৌরবময় যুগ। ইহার রাজধানী ছিল যশোধরপুর, এখন যেখানে আঙ্করথম্। তের শতকে কুবলাই খাঁর এক রাজদূত এখানে আসিয়া এই নগরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এ দেশ ছিল সমৃদ্ধিশালী ও সুশাসিত। অধিবাসীরা ছিল চীনা হিন্দু। নগরে ছিল দশলক্ষ লোকের বাস। রাজপ্রাসাদে সোনা ও মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি। হ্রদে বিলাসীরা নৌকা বিহারে বাহির হইত। রাজপথগুলিতে ছিল রথের ভিড়, পর্দাঢাকা পালকি, হাওদা লাগানো হাতি। ব্রাহ্মণরা আসিয়া বিষ্ণু ও শিবের পূজা প্রচলিত করিয়াছিল এবং চীন পরিবারে বিবাহাদি করিয়া দেশবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। মন্দিরের সংলগ্ন ছিল হাসপাতাল, হাসপাতালে ছিল চিকিৎসক ও সেবিকা।

নগরের কেন্দ্রস্থলে বায়ন মন্দির। স্তরে স্তরে পাথর সাজাইয়া

গড়া এই শিবমন্দির। শীর্ষে মুকুটের মত চূড়া। চারিদিকে তোরণ, তোরণের গায়ে কারুকার্য, উপরে ব্রহ্মার চতুর্মুখ। প্রাচীরে পুরাণের ও দেবদেবীর কাহিনী খোদিত। ইহার তিনশ' বছর পরে নির্মিত হইল আঙ্কর ভাট বিষ্ণুমন্দির। পৃথিবীর মধ্যে এই মন্দির বৃহত্তম। চারিদিক ঘিরিয়া বার মাইল দীর্ঘ পরিখা, তাহার উপর সেতু। পরিখার পর প্রাচীর, প্রাচীরের পশ্চাতে বিশ্রামাগার। ইহার গায়ে রামায়ণ—মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত। তাহার পর প্রশস্ত চত্বরের উপর



বায়ন মন্দিরের গায়ে কারুকার্য



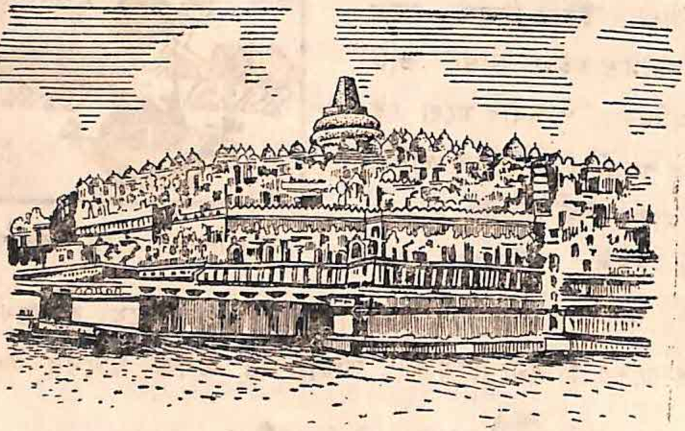
আঙ্কর ভাটের বিষ্ণুমন্দির

পিরামিডের মত থাকে থাকে পাথর সাজানো। তার উপরে দু'শ ফুট উঁচু সর্বোচ্চ শিখরটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান আনাম প্রদেশ ছিল চম্পা। তাম্রলিপ্তির বণিকরা

আসিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে এই রাজ্য স্থাপন করে। এখানেও অনেক সমৃদ্ধ নগর ও সুন্দর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা



বোরোবুদুর

বিরাট এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া আরব বণিকরা মন্তব্য করিয়াছেন। এই বংশের এক রাজা পাল রাজাদের আমলে নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বুদ্ধমন্দির বোরোবুদুর শৈলেন্দ্ররাজদের প্রধান কীর্তি। চারশ' ফুট লম্বা ও চারশ' ফুট চওড়া ইহার ভিত্তিমূল থাকে থাকে উঠিয়াছে, প্রতি স্তরে সাজানো বুদ্ধমূর্তি, মোট চারশ' ছত্রিশটি। তাহার উপর দেওয়ালে বুদ্ধচিত্র উৎকীর্ণ।



বোরোবুদুরের গায়ে নৌকার চিত্র

মধ্যবর্তী স্তূপকে ঘিরিয়া পরপর চক্রাকারে বাহাত্তরটি স্তূপ। এত সুন্দর পাথরের কাজ ও কারুকার্য সমস্ত এশিয়ায় খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ইহার নিকটে প্রন্বনম্-এর ব্রাহ্মণ মন্দির, সৌন্দর্যে প্রায় বোরোবুদুরের সমকক্ষ।

শুধু মন্দির আর মসজিদ নয়, এসব দেশে পাওয়া গিয়াছে বহু ভারতীয় পুঁথি ও তাহার অনুবাদ। এ অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত, পালি ও তামিল মিশিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। সে ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইল। এ সব দেশে প্রচলিত হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণবিভাগ আর ভারতীয় পোশাক, গহনা, নাচ, গান, উৎসব। বালিদ্বীপের লোকেরা এখনও হিন্দু। প্রাচীন ভারতীয়রা ইহাদিগকে যে নাচ শিখাইয়াছিল এখনও বালি মেয়েরা সেই ভঙ্গিতে নাচে।

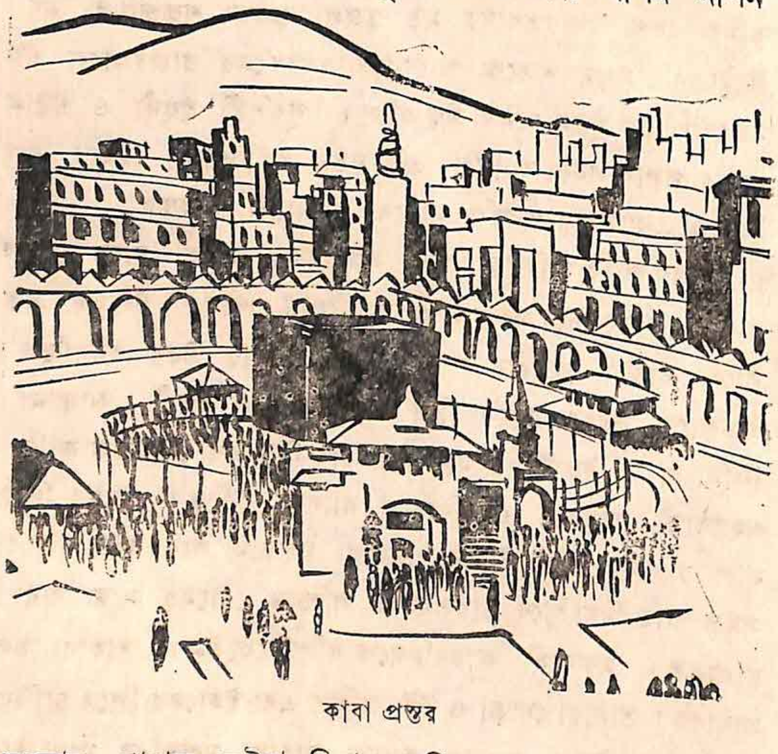
ভারতীয় সভ্যতা বহন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিল ব্রহ্মদেশে, শ্যাম ও লঙ্কায়। এই সমস্ত দেশের মন্দিরে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধার বা আফগানিস্তান যেমন আর্যাবর্তেরই অংশ, সিংহল বা লঙ্কা ছিল তেমনি অনার্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। রামায়ণের যুগে লঙ্কা ছিল অনার্য সভ্যতার কেন্দ্র।

প্রায় সমস্ত এশিয়ায় আজও বৌদ্ধ ধর্ম ছড়াইয়া আছে। আরও কত ধর্মের কথা, কত জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য, কত বড় বড় আবিষ্কার, শিল্প ও চারুকলার রীতি ভারতবর্ষ হইতে ইয়োরোপ ও এশিয়ায় প্রচলিত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। গ্রহনক্ষত্রের কথা, রোগ-চিকিৎসার প্রণালী, গণিতের হিসাব, সামুদ্রিক গণনা, এমন অনেক বিদ্যার ভারতবর্ষে জন্ম হইয়াছিল। এবং এখান হইতে পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছিল। এখনও সমস্ত সভ্যদেশে এসব বিদ্যার চর্চা হয়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে আরব দেশ। মরুভূমির দেশ, ভারতবর্ষের মত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নয়। খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকে আর্যাবর্তে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এই মরুদেশে এক নূতন ধর্মের জন্ম হইল। পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব লইয়া আসিল এই নূতন ধর্মবিশ্বাস। ইহার নাম ইস্‌লাম এবং ইহার প্রবর্তক আরবের ধর্মনায়ক মোহম্মদ।

আরব জাতি ঃ দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ঝোপে ঘেরা মরুদ্যান ও ছোট ছোট শহর। ইহারই এক পাশে প্রাচীন সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। এককালে ইহার উত্তরে ছিল ফিনিশিয় ও ইহুদী আস্তানা। ফিনিশিয় ও ইহুদীদের মত আরবরাও ছিল এক সেমিটিক জাতি। শহরবাসী আরবরা দেশবিদেশে বাণিজ্য করিত। উটের পিঠে মাল চাপাইয়া দল বাঁধিয়া তাহারা মরুভূমি পার হইত, কিংবা সমুদ্র পাড়ি দিয়া পূর্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে রোমের সঙ্গে ব্যবসা চালাইত। মরুবাসী আরবদিগকে বলিত বেদুইন। তাহারা ছিল যাযাবর। তাহারা ঘোড়া ও উট পালিত এবং ইহাদের পিঠে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও কখনও তাহারা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করিত, নয়ত উটের পিঠে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল উটের দুধ আর গাছের খেজুর। যখন কিছু জুটিত না তখন তাহারা মরুযাত্রী বণিকদের পাথেয় ও ধনসম্পদ লুট করিত।

আরবদের মধ্যে ছিল অনেক উপজাতি ও যূথ। সর্বদা পরস্পরের মধ্যে মারামারি লাগিয়াই থাকিত। পুরুষরা বহুবিবাহ করিত। গৃহস্থরা তীর্থযাত্রী অতিথিদের সমাদর করিত। ধর্ম ছিল কুসংস্কারে জর্জর। এক এক যূথের ছিল এক এক দেবতা। মূর্তি গড়িয়া তাহারা এই দেবতার পূজা করিত এবং আপন আপন



কাবা প্রস্তর

দেবতার প্রাধান্য লইয়া বিবাদ করিত। মক্কার চতুষ্কোণ কাল পাথরের মন্দির কাবায় ছিল তিন চারশ' দেবমূর্তি। ইহার মধ্যে প্রধান ছিল এক কৃষ্ণশিলার বিগ্রহ, আল্লার প্রতীক। আল্লাই ছিল সমস্ত যূথদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আরবরা মক্কার কাবামন্দিরে তীর্থ করিতে আসিত। এখানে আসিয়া তাহারা সকল বিবাদ

ভুলিয়া নিজেদের ভাষায় রণগাথা ও প্রেমগীতি রচনা করিত, কবিতা আবৃত্তি করিত, গান গাহিত। আরবদের মুখে মুখে ফিরিত এই কাব্য ও গান।

মোহম্মদ ঃ মক্কায় কাবামন্দিরের রক্ষক ছিল কোরেশ বংশ। এই বংশে ৫৭০ সালে মোহম্মদের জন্ম হয়। অল্প বয়সে তিনি মাতা ও পিতাকে হারাইলেন। পিতৃব্যের ঘরে দারিদ্রের মধ্যে তাঁহাকে মানুষ হইতে হইল। তিনি লেখাপড়া শেখেন নাই। ইহুদী ধর্মনায়কদের মত তিনিও ছেলেবেলায় ছিলেন মেষপালক। বড় হইয়া তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বিধবার অধীনে চাকুরি লইলেন। মালপত্র বোঝাই উটের সারি লইয়া তিনি দেশ বিদেশে ঘুরিতেন। এইরূপে অনেক ধর্ম ও জাতির লোকের সঙ্গে তিনি মিশিবার সুযোগ পাইলেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হইল।

দেখিয়া শুনিয়া মোহম্মদের মনে এক ধর্মপ্রেরণা জাগিল। তিনি খাদিজাকে বিবাহ করিয়া চাকুরির দায় হইতে মুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। মক্কার নিকটে হিরা পর্বতের গুহায় গিয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি লাভ করিলেন ঈশ্বরের বাণী। এই বাণীই ইস্‌লাম ধর্ম। ইস্‌লাম অর্থ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পন। ইহার প্রধান কথা আল্লা বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, আর মোহম্মদ আল্লার আজ্ঞাবাহী শেষ পয়গম্বর বা ধর্ম প্রবর্তক।

মোহম্মদ এই ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরেশরা ইহা পছন্দ করিল না। তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মোহম্মদ রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বস্ত শিষ্য আবু-বকরের সঙ্গে মদিনায় পলাইয়া গেলেন, সেখানকার শাসনভার

গ্রহণ করিলেন। তখন ৬২২ সাল। মোহম্মদের দেশত্যাগকে মুসলমানরা বলে হিজরৎ এবং ঐদিন হইতে তাহারা বর্ষ গণনা করে।

মদিনা ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। মদিনাবাসীরা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। এখানে কিছু ইহুদীও বাস করিত। তাহারা ইস্‌লামের বিরুদ্ধতা করায় মোহম্মদ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া মক্কায় কোরেশদের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ চলিল। শেষে ৬২৯ সালে মোহম্মদ মক্কা অধিকার করিলেন। কাবার দেবমূর্তিগুলি ধ্বংস করা ছাড়া তিনি মক্কাবাসীদের উপর কোন জুলুম করেন নাই। ইহার পর একে একে সমস্ত উপজাতিগুলি মোহম্মদের ধর্ম ও শাসন মানিয়া লইল। মোহম্মদ কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌, মিশর, আবিসিনিয়া, পারস্য এবং চীনে ধর্মদূত পাঠাইলেন। সম্রাট্‌ হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি আরব-সীমান্তের কয়েকটি নগর জয় করিলেন। এই প্রকারে ইস্‌লাম ধর্মের দিগ্বিজয়ের সূচনা করিয়া ৬৩২ সালে তিনি মদিনায় দেহত্যাগ করিলেন।

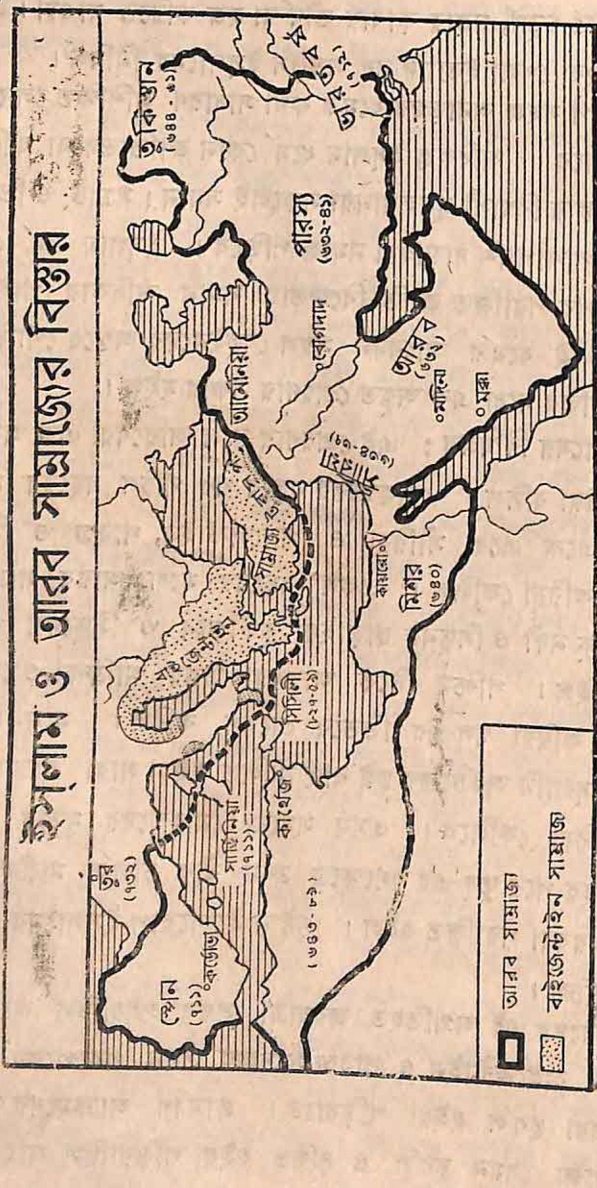
ইস্‌লাম ধর্ম : আল্লার বাণী কোরাণ নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মোহম্মদ বলিতেন যে তাঁহার মুখ দিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বর আল্লা শেষ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লার কোন মূর্তি নাই, তাই মূর্তিপূজা ইস্‌লামে নিষিদ্ধ। আল্লার নিকট যাইবার জন্য কোন পুরোহিত বা পূজা দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রার্থনা দ্বারা পাপী আল্লার ক্ষমা লাভ করে এবং আল্লার কাছে যাইতে পারে। ইহাতে সকল মুসলমানের সমান অধিকার। সুতরাং তাহার প্রথম কর্ম দিনের মধ্যে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়া। মুসলমানের দ্বিতীয় পুণ্যকর্ম দরিদ্রকে জাকাৎ বা ভিক্ষা দেওয়া; তৃতীয়, রমজানের মাসে দিবাভাগে উপবাস করিয়া রোজা পালন

করা ; আর চতুর্থ, মক্কার কাবায় তীর্থ বা হজ করিতে যাওয়া। মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি বদ অভ্যাস ইস্‌লামের নিষিদ্ধ।

এইরূপ সহজ অনাড়ম্বর ধর্মের কথা সাধারণ অশিক্ষিত লোকেও বুঝিতে পারে। অধিকন্তু ইস্‌লাম ধর্মে কোন জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই। আল্লায় বিশ্বাসী মুসলমানরা সকলেই সমান। সম্রাট্ ও ভিক্ষুক মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িবে। ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পর পরাজিত জাতি বিজেতার সমান অধিকার পাইবে। সহজেই এই ধর্মের আবেদন সরল বেদুইনদের অন্তরে পৌঁছিল। আরব জাতির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রেরণার সঞ্চার হইল।

ইস্‌লামের দিগ্বিজয়ঃ এই প্রেরণার বলে আরবেরা এক অসাধ্য সাধন করিয়া বসিল। মোহম্মদের মৃত্যুর পর পঁচিশ বছরের মধ্যে তাহারা একে একে সীরিয়া ও প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর অধিকার করিয়া ফেলিল। একশ' বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য পূর্বে অক্ষু নদী ও সিন্ধুনদ ছাড়াইয়া তুর্কীস্তান ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। পশ্চিম দিকে আরবরা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন অধিকার করিয়া গল্-এর ভিতরে প্রবেশ করিল। মনে হইল বুঝি বা ইস্‌লামি অর্ধচন্দ্রের দুই বাহু মিলিত হইয়া সারা ইয়োরোপ গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এমন সময়ে, মোহম্মদের মৃত্যুর ঠিক একশ' বছর পরে তুর্-এর রণক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক বীর চার্লস মার্টেল-এর নিকট আরবরা পরাজিত হইল। খৃষ্টান ইয়োরোপ ইস্‌লামের হাত হইতে বাঁচিল।

আরবদের এই অপ্রতিহত জয়যাত্রা সম্ভব হইয়াছিল কয়েকটি কারণে। বাইজেণ্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য তখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জার্মাণ আক্রমণের সময়ে রোমসাম্রাজ্য যেমন দুর্বল ও দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল আরবদের


ইস্লাম ও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার
তুর্কিস্তান
(৭৪৪-৫১)
ভারত
পারস্য
বোগদাদ
আর্মেনিয়া
আরব
(৬৩২)
মদিনা
মক্কা
বাইজেন্টাইন
সাম্রাজ্য
কায়রো
মিশর
(৬৪০)
সিসিলী
কার্থেজ
সার্ডিনিয়া
(৭১১)
তুর্স
(৭৩২)
স্পেন
(৭১১)
কর্ডোভা
আরব সাম্রাজ্য
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য

কালে ইহাদেরও ছিল সেই অবস্থা। শাসন ও শোষণের চাপে প্রজারা ছিল বিক্ষুব্ধ। এদিকে আরবরা আসিল এক হাতে কোরাণ, অন্য হাতে তরবারি লইয়া। তাহাদের সেনাপতিরা সুদক্ষ ও অসমসাহসী। তাহাদের সমাজে ভেদাভেদ নাই। তাহারা বিজিত জাতিদের নিকট দুইটি সর্ত আনিয়া হাজির করিল—হয় কর দিয়া বশ্যতা স্বীকার কর, কিংবা মুসলমান হইয়া সমান অধিকার



তুর্-এর যুদ্ধ

লাভ কর। সিন্ধুর ভারতীয়, পারস্যের ইরানী, মধ্য এশিয়ার তুর্ক ও তাতার, আফ্রিকার নিগ্রো ও মূর, এমন কি স্পেনের গথরা ইস্‌লামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া এই ধর্ম গ্রহণ করিল। আরবরাও ইহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলা গ্রহণ করিয়া সুসভ্য হইয়া উঠিল।

খলিফা : ইস্‌লামের দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন খলিফারা। ইহারা ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক।

মৃত্যুর পূর্বে মোহম্মদ তাঁহার প্রধান শিষ্য আবুবকরকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান। আবুবকর মৃত্যুর সময়ে খলিফা নিযুক্ত করিলেন ওমরকে। ওমরের পর একে একে খলিফা নিযুক্ত হইলেন ওস্মান ও আলি। সরল ও পবিত্র জীবনের জন্য এই চারজন 'পুণ্যবান খলিফা' নামে খ্যাত।

আবুবকর ছিলেন মোহম্মদের কনিষ্ঠা পত্নী আয়েশার পিতা এবং মোহম্মদের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল অসীম। কোরেশরা যখন মক্কায় মোহম্মদকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে তখন তিনিই একাকী মধ্যরাত্রে তাঁহাকে লইয়া মদিনায় পলাইয়া আসেন। খলিফা হইবার পর তিনি নিজের পর্ণকুটিরে বাস করিতেন আর মসজিদে বসিয়া রাজকার্য চালাইতেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি যখন ওমরকে খলিফা মনোনীত করিলেন তখন ওমর বলিলেন, "আমার খিলাফতে প্রয়োজন নাই।" আর আবুবকর উত্তর দিলেন, "কিন্তু খিলাফতের যে তোমাকে প্রয়োজন আছে।"

জেরুসালেমের পতনের পর ওমর আসিলেন মদিনা হইতে খ্রীষ্টান পুরোহিতের বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য। উটের পিঠে চাপিয়া ছ'শ মাইল মরুপথ বাহিয়া খলিফা আসিলেন, সঙ্গে ঝুলিতে যব ও খেজুর এবং একজন সহচর। খলিফার হওয়া উচিত এমনি সরল প্রকৃতি ও কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু পুরীর নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে সুন্দর সাজসজ্জা করিয়া তাঁহার সেনাপতিরা দাঁড়াইয়া আছে। খলিফা অবাক্! এই শৌখিন বাবুরা নাকি ইস্লামের ধর্মযোদ্ধা। ইহাদিগকে না তাড়াইলে ইস্লামের আর রক্ষা নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর ইট পাটকেল ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাহারা পলাইয়া গেলে পর তিনি একাকী পুরোহিতের সঙ্গে জেরুসালেমের গির্জায় প্রবেশ করিলেন।

ওসমানের সময় হইতে খলিফারা এই সরল ধর্মপরায়ণতা হারাইতে লাগিলেন। আলির পর ইহা একেবারে দূর হইল। খলিফাদের সরলতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের একতাও চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল।

আলি ছিলেন মোহম্মদের জামাতা। তিনি শত্রুর চক্রান্তে প্রাণ হারাইলেন। এবার খলিফা হইলেন মোয়াবিয়া। তাঁহার পর হইতে খিলাফৎ বংশগত হইয়া দাঁড়াইল। এ বংশের নাম উমাইয়াদ বংশ। আলির দুই পুত্র ছিলেন, হাসান ও হোসেন। তাঁহারা মোহম্মদের দৌহিত্র, তাঁহাদের দেহে রসুলের রক্ত। এক দল তাঁহাদের পক্ষ লইয়া বলিল খলিফার পদ তাঁহাদেরই প্রাপ্য। উমাইয়াদরা খলিফার পদ ছাড়িতে রাজী হইল না। তাহারা আলিকে নির্বংশ করিবার জন্য হাসানকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিল, তারপর হোসেনের প্রাণ লইবার জন্য সচেষ্ট হইল।

তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ দামাস্কাসে খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত। কুফা হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া হোসেন মক্কা হইতে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার পরিবার ও মাত্র শ'দুই সহচর। কুফার শাসক ছিলেন উমাইয়াদ্‌দের সমর্থক। তাঁহার ফৌজ কারবালার প্রান্তরে হোসেনের পথ রোধ করিল। হোসেন সদলবলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। হোসেনের দুই পুত্র ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শত্রুর হাতে নিহত হইল। হত্যাকারীরা সত্তরটি ছিন্ন মস্তক আনিয়া কুফার শাসককে উপহার দিল।

মোহরম মাসের দশম দিনে কারবালার বালুরাশি লাল করিয়া হজরতের বংশধররা বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিলেন। সমস্ত মুসলিম জগৎ শিহরিয়া উঠিল। শহীদ হোসেনের রক্তসিঞ্চনে এক নূতন বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইল; সে বিশ্বাস এই যে,

একমাত্র হজরতের বংশই খিলাফতের অধিকারী। এই বিশ্বাসপরায়ণ দল হইল সিয়া, আর প্রতিপক্ষ সুন্নী। মুসলিম সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

৭৫৩ সালে উমাইয়াদ্‌দিগকে সরাইয়া খিলাফৎ অধিকার করিল আব্বাসের বংশ। আব্বাস ছিলেন মোহম্মদের কাকা। আব্বাসীয়রা তাই সিয়াদের সমর্থন পাইলেন। তাঁহারা দামাস্কাস ধ্বংস করিয়া চলিয়া আসিলেন, তাইগ্রীস নদীর তীরে স্থাপন করিলেন নূতন রাজধানী বোগ্‌দাদ।

বোগ্‌দাদ: আব্বাসের বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন-অল্‌-রশিদ। আরব্য উপন্যাসের উপকথায় তিনি অমর হইয়া আছেন। তখন বোগ্‌দাদ ছিল যেন এক স্বপ্নপুরী, শিল্পে, সম্পদে ও বিলাসব্যসনে উচ্ছলিত। রাজপ্রাসাদের চাকচিক্য ও রাজসভার আড়ম্বর ছিল বাইজেন্টিয়ামের মত। উজীর ও দেওয়ানরা রাজকার্য দেখিত। তাহাদের নীচে বিভিন্ন শাসন বিভাগে ছিল আমলারা। চারিদিক হইতে লুণ্ঠন ও বাণিজ্যের সম্পদ আসিয়া বোগ্‌দাদে জমা হইত। আর আসিত ক্রীতদাস। বিত্তশালী আমীর আমলা সালার ও সওদাগররা যেমন আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতেন তেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করিতেন। দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতরা আসিতেন। ভারতীয়, গ্রীক, ও ইহুদী মনীষীরা আসিয়া পারসীক ও আরবদের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করিতেন। আরবী ভাষায় গ্রীক ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইত। কবি, বাদ্যযন্ত্রী, গায়ক ও নটরা নাগরিকদিগকে আনন্দ দান করিত। বোগ্‌দাদের বাজারে পণ্য আসিত দেশদেশান্তর হইতে। ধনী ব্যবসায়ীদের আনাগোনায় শহর সরগরম হইয়া থাকিত। ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক ও লেখকদের ছিল খুব সম্মান।

নবম শতকের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ হুনাইন ইবন্ ইশাকের দেশ ছিল বোগ্‌দাদের দক্ষিণে হিরা শহরে। বাল্যকালে তিনি বোগ্‌দাদের এক ডাক্তারখানায় কাজ করিতেন। একদিন ডাক্তার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন হিরার লোক ওষুধপত্রের কিছু বোঝে না, বাজারে বসিয়া পয়সাকড়ি নাড়াচাড়া করাই তাদের উপযুক্ত কাজ। হুনাইন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। অটল প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি গ্রীক ভাষা শিখিলেন, চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িলেন। সমস্ত শিখিবার পর তিনি গ্রীক আয়ুর্বেদ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আরবী ভাষায় তর্জমা করিলেন। এক একটি বই অনুবাদ করিবার জন্য খলিফা তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিতেন বই-এর ওজনে সোনা। একবার কোন এক শত্রুকে হত্যা করিবার জন্য খলিফা তাঁহাকে বলিলেন বিষ তৈয়ারী করিতে। হুনাইন অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমার শিক্ষা মানুষকে বাঁচাইবার জন্য, মারিবার জন্য নহে।" অবাধ্যতার অপরাধে খলিফা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। অবশ্য পরে তাঁহার সততায় সন্তুষ্ট হইয়া খলিফা তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। বিদ্যার সঙ্গে চরিত্রের এমন সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না।

স্পেনঃ আব্বাসীয়রা খলিফা হইয়া বসিবার পর আব্দ ল রহমান নামে উমাইয়াদ বংশের এক যুবক স্পেনে আসিয়া মুসলমান রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। আরবরা সংখ্যায় ছিল অল্প, অধিকাংশ ছিল ইস্‌লামে দীক্ষিত গথ এবং আফ্রিকার মূর জাতির মুসলমান। কর্ডোভার উমাইয়াদ্‌রা প্রথমে ছিলেন 'আমীর'। পরে আব্বাসীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাঁহারাও আপনাদিগকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পর-ধর্মের প্রতি তাঁহাদের উদার আচরণ ছিল সে যুগের বিস্ময়। তাঁহার

কোথাও গির্জা নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও জোর করিয়া মুসলমান করেন নাই।

স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম স্পেন ছিল ইয়োরোপের পুরোভাগে। কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, টলেডো, প্রভৃতি নগরী চমৎকার প্রাসাদ ও মসজিদে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। দেওয়ালে রঙিন টালি ও



আলহাম্ব্রা প্রাসাদের বাতায়ন পথে গ্রানাডার কারাগারের দৃশ্য

নক্শার জৌলুস, বিরাট প্রাঙ্গণ জুড়িয়া অগণিত স্তম্ভের সারি তাহার উপর অর্ধচক্রাকৃতি খিলান, শীর্ষদেশে সুগোল গম্বুজ, ভিতরে আলোছায়ার খেলা, বাহিরে আকাশচুম্বি মিনার, সমস্ত মিলিয়া নির্মাণকলার এক অপূর্ব মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

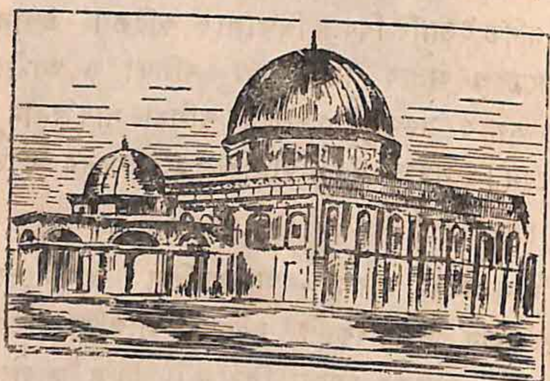
কর্ডোভার মসজিদে ও গ্রানাডার রাজপুরী আল্‌হাম্ব্রায় বৃহৎ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিখুঁত সমন্বয় ঘটিয়াছে।

জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনচর্চায় স্পেন ছিল ইয়োরোপের শিক্ষাগুরু। মুসলমান জগতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এখানে আসিতেন, বড় বড় মসজিদে কিংবা বাগানে স্কুল খুলিয়া বসিতেন। এখানে কেবল কোরাণ পাঠ হইত না, ছাত্ররা কাব্য, ইতিহাস, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। খ্রীষ্টান কিংবা ইহুদী ছাত্রেরও অভাব ছিল না। খলিফা ও আমীররা বহু অবৈতনিক স্কুল ও সরকারী গ্রন্থাগার খুলিয়া সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করেন। সঙ্গীত এবং কারুশিল্পেও স্পেনের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

ইস্‌লামি সভ্যতা ঃ আরবরা আসিয়াছিল জার্মানদের মতই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়া। সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহারা ছিল সভ্যজগতের অনেক পিছনে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের অধিবাসীরা আরব বলিয়া পরিচিত হইল। সভ্যতার ইতিহাসে আরব বলিতে এই সব অঞ্চলের আরবীভাষী মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

গ্রীক, পারসীক, ইহুদী ও ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা মিশাইয়া আরবরা এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। ইয়োরোপ যখন অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছিল তখন বোগ্‌দাদ, কায়রো, কর্ডোভা, প্যালের্মা প্রভৃতি নগর হইতে এই সভ্যতার আলো আসিয়া পড়িল ইয়োরোপের অঙ্গনে। আরবরা গ্রীক ও ভারতীয়দের নিকট শিখিল জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত, আয়ুর্বেদ। তাহারা অঙ্কের রাশি ও

দশমিক ভগ্নাংশ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া ইয়োরোপকে দান করিল। আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিদ্যা, এরিস্টট্‌ল-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইউক্লিডের জ্যামিতি, গেলেনের চিকিৎসাশাস্ত্র তাহারা নিজেদের গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ করিল। আরববিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে রসায়নবিদ্যার জন্ম হইল। আরব কারিগর চীন হইতে শিখিয়া ইয়োরোপে লইয়া আসিল কাগজ তৈয়ারীর কৌশল। প্রশান্ত



জেরুসালেমে মোহম্মদের স্মৃতিগম্বুজ 'ডোম অফ দি রক'
৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই সৌধ আরবরা রোমক ও
বাইজেন্টাইন শিল্পের অনুকরণে সুন্দর কারুকার্য
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহাদের বাণিজ্যপথ, মধ্য এশিয়া হইতে স্পেন পর্যন্ত প্রসারিত তাহাদের সাম্রাজ্য। অতএব ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞান তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। কাব্যে, সাহিত্যে এবং ইতিহাসে ও জীবনচরিত রচনায় আরবপ্রতিভা ছিল যথেষ্ট মৌলিকতার অধিকারী।

মস্‌জিদগুলি ছিল শিক্ষাগার। ক্রমে ক্রমে এগুলি উন্নত হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে দেশবিদেশ হইতে গুণী লোকের সমাগম

হইত, সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হইত। কেবল আরবের মুসলমান নয়, এখানে শিক্ষা লইতে আসিত সকল জাতির ও সকল ধর্মের ছাত্র। নগরে নগরে মানমন্দির, পরীক্ষাগার, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির আশ্রয়ে লালিত হইত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা। পরিণামে ইহা ইয়োরোপকে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার হইতে মুক্তির পথ দেখাইল।

আরব মনীষীদের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবু-সিনা। তুর্কিস্তানে বোখারায় তাঁহার জন্ম। সেখান হইতে তিনি পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানে আসিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁহার জীবন ছিল ঋষির মত নিস্পৃহ। এরিস্টট্‌ল-এর দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন কর্ডোভার ইব্‌ন্ রুশদ্। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ধর্মের শাসন হইতে মুক্ত করা তাঁহার বিশেষ কীর্তি। সেভিলের ইব্‌ন্ খাল্‌দুন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁহার বৈশিষ্ট্য ইতিহাস রচনায় ভাব ও উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার অবতারণা। অল্ বিরুনী ও ইব্‌ন্ বাতুতা ছিলেন পর্যটক। অল্ বিরুনী সুলতান মামুদের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি আগ্রহ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শন ও গণিত পাঠ করিয়াছিলেন ও এ দেশ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্‌ন্ বাতুতা নানা দেশ ঘুরিয়া ১৩৩৩ সালে ভারতবর্ষে আসেন। সুলতান মোহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক তাঁহাকে দিল্লীর কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সুলতানের দূত হইয়া চীনদেশে যান। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর নাম 'সফরনামা'। এই দুই লেখকের বিবরণ হইতে আরব ও তুর্ক আমলের ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

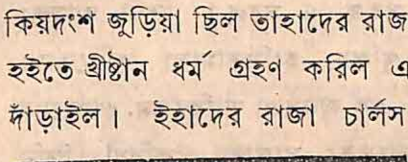
কালক্রম

৫৭০ মোহম্মদের জন্ম

ভারতে	৬২২ হিজরৎ। মোহম্মদের মদিনা রাজ্য	পারস্য
হর্ষবর্দ্ধন	৬২৯ মোহম্মদের মক্কা জয়, ৩২-মৃত্যু, আবুবকর খলিফা	সিরিয়া
চীনে		
তাইসুং	৬৩৪ ওমর খলিফা	
বাইজেন্টিয়ামে		ও মিশর
হেরাক্লিয়াস	৬৪৪ ওসমান খলিফা	বিজয়
		মধ্য এশিয়া
	৬৫৬ আলি খলিফা	ও উত্তর
	৬৬০ উমাইদ্ বংশ খলিফা	আফ্রিকা
	৬৮০ কারবালা। হোসেনের মৃত্যু	বিজয়
	৬৮৯	
	৭০১	স্পেন বিজয়
	৭৩২	তুর-এর
		পরাজয়
	৭৫০ আব্বাসীয় বংশ খলিফা	
	৭৫৫ কর্ডোভায় উমাইদ বংশ	স্পেনে
		আব্‌দল
৭৬৮		রহমন
মধ্য	৭৮৬ বোগ্‌দাদে	
ইয়োরোপে		
শার্লামেন		
৮১৪	৯৮০ হারুন অল্-রশিদ	

আবুসিনা ইব্‌ন্ রশিদ্ ইত্যাদি

পঞ্চম শতকে রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর জার্মান হানাদাররা কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করিল। ইহাদের মধ্যে ছিল ফ্রাঙ্ক নামে এক জার্মান উপজাতি। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিয়দংশ জুড়িয়া ছিল তাহাদের রাজ্য। ফ্রাঙ্করা রোমানদের নিকট হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিল এবং সেই ধর্মের রক্ষাকর্তা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের রাজা চার্লস মার্টেল-এর হাতে দিগ্বিজয়ী আরব মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং পিরানীজ পর্বতের পিছনে হটিয়া গিয়া স্পেনে রাজ্য গঠন করে।



শার্লামেন

ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত শার্লামেন বা মহাবীর চার্লস (৭৬৮—৮১৪)। তিনি ছিলেন বোগ্‌দাদের খলিফা হারুন অল্‌-রশিদের সম-সাময়িক। তাঁহার চেহারা ও স্বভাবের বর্ণনা করিয়াছেন জীবনীলেখক আইনহার্ড। চার্লসের ছিল সুগঠিত দেহ, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, উন্নত নাসা, হাসিভরা মুখ তিনি পরিতেন ফ্রাঙ্কদের সাদাসিধা জাতীয় পোশাক,—সুতার পাজামা, কোট ও লম্বা পিরান। উৎসবে অনুষ্ঠানে কদাচিৎ গায়ে

দিতেন রূপালী পাড়ের কুর্তা, মাথায় পরিতেন মণিমুক্তাবসানো মুকুট আর কটিবন্ধে থাকিত সোনারূপার বাঁটযুক্ত তরবারি। তিনি পুত্রকন্যাদিগকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বাহির হইতেন। শিকার, সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়ায় ছিল তাঁহার অফুরন্ত উৎসাহ। তিনি যেমন প্রচুর খাইতে পারিতেন তেমন তাঁহার দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। তাঁহার এক ঘুষির আঘাতে ঘোড়া ও আরোহী একসঙ্গে ধরাশায়ী হইত। এতবড় মানুষটি ছিলেন কিন্তু একেবারে সহজ ও সরল। তিনি আমলা সভাসদ্দের সঙ্গে মিশিতেন, প্রাণ খুলিয়া হাসিতামাসা করিতেন। প্রতি বছর শীতের শেষে তিনি এক জনসভা ডাকিতেন, প্রজাদের কথা শুনিতেন। সভায় প্রজাদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও। তবেই ত' বুঝিব আমাকে কি করিতে হইবে।'

শার্লামেন ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীর। ছেচল্লিশ বছরের রাজত্বকালে তিনি বাহান্নবার যুদ্ধযাত্রা করেন। দক্ষিণে পিরানীজ ও আলপস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। উত্তর স্পেনের মূররা, উত্তর-ইটালীর লম্বাডরা, উত্তর জার্মানীর স্যাক্সনরা এবং পূর্ব ইয়োরোপের আরবরা একে একে তাঁহার বশীভূত হইল। স্পেনের মূরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া তিনি ইয়োরোপীয়দের অন্তর জয় করিলেন। ৭৭৮ সালে উত্তরপূর্ব অংশ করায়ত্ত করিয়া তিনি সসৈন্যে পিরানীজের পথে ফ্রান্সে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সেনা-বাহিনী একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আসিবামাত্র গ্যাস্কন নামে এক পার্বত্য উপজাতি অতর্কিতে ইহার পশ্চাদ্দেশ ঘিরিয় ফেলিল। এই অংশের অধিনায়ক ছিলেন রোল্যাণ্ড। তিনি ও তাঁহার

সহকারীরা সম্রাটের বাহিনীর পিছনদিক আগলাইয়া গ্যাস্কনদের গতিরোধ করিলেন। রোল্যাণ্ড যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। এই অবসরে ফ্রাঙ্কসেনা নিরাপদে পিরানীজ্ পর্বত পার হইয়া গেল। শার্লামেন ও রোল্যাণ্ডের এই বীরত্বকাহিনী 'রোল্যাণ্ডের গীতি' নামক লোকগাথায় অক্ষয় হইয়া আছে। ফ্রান্সের চারণ কবিদের মুখে মুখে ফিরিত এই গীতিকাব্য।

চার্লসকে সবচেয়ে বেশী বিব্রত হইতে হইয়াছিল উত্তর জার্মানীতে স্যাক্সনদিগকে লইয়া। এই জার্মান উপজাতি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাই। নিজেদের পুরুষানুক্রমিক পূজা-পরবে তাহাদের



শার্লামেনের সাম্রাজ্য

ছিল অগাধ বিশ্বাস। চার্লস তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। স্যাক্সনরাও তাহাদের দেশ ও ধর্মের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িতে লাগিল। তাহারা পরাস্ত হইয়াও বশ মানে না, সুবিধা পাইলেই আবার বিদ্রোহ করিয়া বসে। শেষে শার্লামেন ক্ষিপ্ত হইয়া হাজার হাজার বন্দী

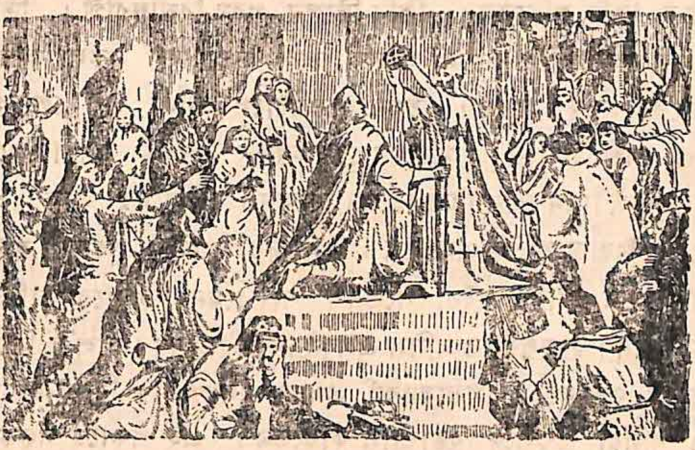
স্যাক্‌সনকে হত্যা করিলেন, হাজার হাজার লোককে বাস্তুচ্যুত করিয়া অন্য দেশে চালান দিলেন। এইরূপ কঠোর শাস্তি দিবার পর তিনি স্যাক্‌সনদের দেশে গির্জা নির্মাণ করিলেন, খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী পাঠাইলেন, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করিলেন।

ইহার পর শার্লামেন পূর্ব সীমান্তে দুর্দান্ত আরব জাতিকে দমন করিলেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল কঠোরতা ও মানবতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। এ জন্যই তিনি এত বড় সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিয়াছিলেন।

শার্লামেনের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বোগদাদ হইতে হারুন-অল-রশিদ তাঁহাকে একটি হাতী ও জলঘড়ি উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঘড়িটা জলের চাপে আপনাআপনি চলিত। হাতীটা পাইয়া জার্মানরা খুব খুশী হইয়াছিল।

ইয়োরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের কেন্দ্র ছিল রোম। এখানে বাস করিতেন ধর্মগুরু পোপ। খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসনকে বলিত চার্চ। বাইজেন্টিয়ামকে কেন্দ্র করিয়া ছিল এক স্বতন্ত্র চার্চ বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপের খ্রীষ্টানরা ছিল রোমান চার্চ ও পোপের অধীন। শার্লামেনের সময়ে পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। তিনি এক বিরোধী দলের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া ফ্রাঙ্করাজের শরণাপন্ন হইলেন। চার্লস্‌ বিরোধীদিগকে শাস্তি দিয়া পোপকে নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লিও এই উপকারের যে প্রতিদান দিলেন তাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। ৮০০ সালে রোমের সেন্ট পিটার গির্জায় পবিত্র খ্রীষ্টমাসের উৎসব চলিতেছিল। শার্লামেন নতজানু হইয়া দেবীর সম্মুখে প্রার্থনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পোপ আসিয়া তাঁহার মাথায়

মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাঁহাকে রোম সম্রাট অগস্টাস বলিয়া সংবর্ধনা ও জয়ধ্বনি করিলেন। পোপ দেখাইতে চাহিলেন যে তাঁহার সমর্থন লইয়াই পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য আবার বাঁচিয়া উঠিল এবং শার্লামেন রোমসম্রাটের গৌরব লাভ করিলেন। আসলে শার্লামেনের এবং ফ্রাঙ্করাজ্যের নূতন নামকরণ হইল মাত্র, তাহার বেশী কিছু নয়।



শার্লামেনের রাজ্যাভিষেক

চার্লস ছিলেন মনে প্রাণে ফ্রাঙ্ক। কিন্তু রোমের অতীত কীর্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। রাইন নদীর তীরে তিনি স্থাপন করিলেন তাঁহার রাজধানী আকেন নগর। এখানে শিল্পীরা নির্মাণ করিল রাজপ্রাসাদ, গির্জা, মণ্ডপ, স্নানাগার। বাইজেন্টিয়াম ও রেভেনার অনুকরণে রঙিন পাথর ও কাঁচ দিয়া গির্জা সাজানো হইল। লোকে বলিত আকেন যেন নবীন রোম।

চার্লস ছিলেন একেবারে নিরক্ষর। তিনি জার্মান ও ল্যাটিন

ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন, গ্রীক ভাষাও বুঝিতেন কিন্তু লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন না। অথচ লেখাপড়ার ওপর তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লিখিতে শিখিবার খুব চেষ্টা করিতেন। রাত্রে বালিশের নীচে শ্লেট ও পেনসিল লইয়া শুইতেন মাঝে মাঝে লেখা অভ্যাস করিবেন বলিয়া। কিন্তু এ শিক্ষা আর হইয়া ওঠে নাই। আহারের সময় একজন ইতিহাসের বই পড়িত, তিনি শুনিতেন। তিনি ছিলেন পরম বিদ্যানুরাগী। তিনি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, অনেক ভাল ভাল বই নকল করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তখন ইয়োরোপে জ্ঞানী গুণী লোকের সংখ্যা বেশী ছিল না। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া শার্লামেন জ্ঞান বিস্তারে মন দিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইংরাজ পণ্ডিত এলকুইন। ডেনদের আক্রমণে গৃহহারা হইয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। শার্লামেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। রাজপুরীতে বসিল এলকুইনের বিদ্যালয়। চার্লস্ নিজে, তাঁহার সন্তানরা ও সভাসদবর্গ এখানে এলকুইনের নিকট ছাত্রের মত বসিয়া একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এই প্রকারে অন্ধকার ইয়োরোপের মাঝখানে প্রথম জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল।

সভ্যতার আলোকসঞ্চারী নব্য রোমসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা এবং মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শার্লামেন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইয়োরোপের উপর আবার বিধাতার অভিশাপ নামিয়া আসিল। ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। ইহার এক খণ্ডের অধিপতি শার্লামেনের বংশধররা আপনাদিগকে রোমসম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সম্রাট্ এবং পোপ উভয়ে খ্রীষ্টান জগতের প্রভুত্ব লইয়া এক দীর্ঘস্থায়ী আত্মঘাতী বিবাদে লিপ্ত হইলেন।

রোমসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় সংগঠন শিথিল হইয়া গেল। জার্মানরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্য স্থাপন করিল বটে, কিন্তু দেশ শাসনের কাঠামো কিংবা সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার কোথাও রহিল না। ইহার ফলে চারিদিকে দেখা দিল অরাজকতা। সুযোগ পাইলেই প্রবল দুর্বলের উপর ডাকাতি, লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাইত। তাহার উপর ছিল বাহিরের উৎপাত। উত্তরদিক হইতে নরম্যানরা, পূর্বদিক হইতে হাঙ্গারিয়ানরা আর দক্ষিণদিক হইতে আরবরা ইয়োরোপের উপর আসিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। চারিদিকে অশান্তি এবং উদ্বেগের মধ্যে কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিল সামন্তপ্রথা।

সামন্তপ্রথা ঃ এই প্রথার উৎপত্তি একদিনে হয় নাই। শত শত বছরের অরাজকতার চাপে এই ব্যবস্থা এক এক দেশে এক এক রূপ লইয়া গড়িয়া ওঠে। ইহার আসল কথা হইল সমাজের বড় ছোটর মধ্যে, প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে একটা চুক্তি। সাধারণ লোকের প্রয়োজন হইল একটা আশ্রয়ের। তাহারা চাহিল আপৎকালে কোন রাজন্য অথবা জমিদার তাহাদিগকে রক্ষা করুক। রাজন্যদের শত্রুর অভাব ছিল না। তাহাদের প্রয়োজন হইল একদল অনুচরের, যাহারা যুদ্ধের সময়ে পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, শান্তির সময়ে রাজ্যের অথবা জমিদারির কাজকর্ম দেখিবে। পরস্পরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি হইল। ছোট বড় সকলেই ঊর্ধ্বতন এক প্রভুর শরণ ও তাহার অনুগত

হইল। বিনিময়ে প্রভু অনুগতকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবার ভার লইল। রাজার নীচে রাজন্য বা সামন্ত, তাহার নীচে উপসামন্ত, সকলের নীচে চাষী ও ভূমিদাস, সমাজে এইরূপ স্তরবিভাগ হইল।

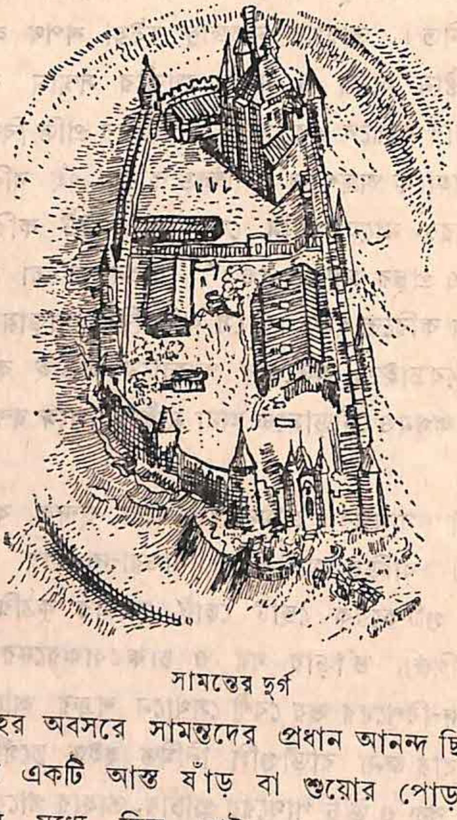
এই ব্যবস্থায় রাজা ও সাধারণ লোকের মাঝখানে সৃষ্টি হইল এক শ্রেণীর অভিজাত সামন্ত। সামন্তরা ছিল জমির মালিক এবং প্রভাবশালী। তাহারা জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিত না। বেশীর ভাগ জমি চাষী ও ভূমিদাসদিগকে ইজারা দিত, আর কিছু জমি নিজের জন্য রাখিয়া তাহাদিগকে দিয়া চাষ করাইত। ইহার আয় হইতে তাহাদের খরচ চলিত। নীচের দিকে তাহারা চুক্তিবদ্ধ ছিল নি এলাকায় প্রজাদের রক্ষা করিতে, উপর দিকে তাহা রা চুক্তিবদ্ধ ছিল রাজার সেবা করিতে। যুদ্ধ বাধিলে রাজদরবার হইতে তাহাদের ডাক পড়িত, রাজার হইয়া তাহাদিগকে লড়াই করিতে হইত। এই রাজসেবার বদলেই তাহারা ভোগ করিত জমির ও প্রজাদের উপর অধিকার।

সামন্তদের মধ্যে সকলের অবস্থা সমান ছিল না। কেহ কেহ ছিল প্রায় রাজার সামিল, কেহ বা ছিল উর্ধ্বতন সামন্তের উপসামন্ত। সামন্ত পরিবারের সকলেই যে জমিদার ছিল তাও নয়। যাহারা একটু নীচু স্তরের কিংবা যাহাদের ভূসম্পত্তি ছিল না, তাহারা বাল্যকালে প্রভুর গৃহে বাস করিয়া তাহার সেবা করিত। চৌদ্দ বছর বয়সে তাহারা প্রভুর 'স্কোয়ের' বা অনুচর সংজ্ঞা লাভ করিত। তখন হইতে তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে ও অস্ত্র চালাইতে শিখিত, প্রভুর ঢাল বহিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইত। আর শিখিতে হইত বীরোচিত আদব-কায়দা। লেখাপড়ার বালাই অবশ্য ছিল না।

একুশ বছর বয়সে স্কোয়েরে হইত নাইট। সারাদিন উপবাস ও রাত্রিজাগরণের পর প্রভুর কাছ হইতে সে নাইটের বীরধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শুনিত। তারপর নতজানু হইয়া শপথ লইত যে সে আজীবন খ্রীষ্টান ধর্মের ও নারী জাতীর সম্মান রক্ষা করিবে, বিপন্নকে উদ্ধার করিবে এবং সাথী নাইটদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। তখন প্রভু তাহাকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া এই বলিয়া আশীর্বাদ করিত "ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে নাইট করিলাম। তুমি বীর, নির্ভয় ও প্রভুর অনুগত হও।" জীবন ভরিয়া নাইটকে এই বীরধর্ম পালন করিতে হইত। সে বর্ম পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বর্শা হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, কর্তব্যের আহ্বানে লড়াই করিতে যাইত আর কখনও কখনও ক্রীড়ামঞ্চে অন্য নাইটের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইত।

বিত্তশালী সামন্তরা জমিদারির মধ্যে সুন্দর বাড়ি করিয়া বাস করিত। বাড়ির মাঝখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্য প্রকাণ্ড হলঘর, পাশে গুটিকয়েক ছোট ছোট শোয়ার কুঠরি। উঠানের অন্য ধারে গির্জা, ভাঁড়ার ঘর ও চাকরবাকরদের আটচালা। যেখানে আপদ-বিপদের ভয় বেশী সেখানে শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য বাড়ীগুলি নির্মিত হইত দুর্গের আকারে। উঠান ঘিরিয়া পুরু ও উঁচু পাথরের প্রাচীর, তাহার গায়ে মাঝে মাঝে সরু লম্বা করিয়া কাটা ছিদ্র। প্রাচীর ঘিরিয়া পরিখা, পরিখার উপর সেতু, দরকার মত পাতা ও তোলা যায়। ফটকের পাশে লোহার মই দেওয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে, ইহাও আবশ্যক হইলে গুটাইয়া ফেলা যায়। যেখানে শত্রুর ভয় কম সেখানে প্রাকার-পরিখা থাকিত না। বাড়িগুলি তৈয়ারী হইত ইট ও কাঠ দিয়া। ভতরে বেশী আলো বাতাস যাইত না। মোমবাতি ও মশাল

জ্বালিয়া ঘরের অন্ধকার দূর করা হইত। দেওয়ালে থাকিত পর্দা ও ঝালরের আবরণ।



সামন্তের দুর্গ

যুদ্ধবিগ্রহের অবসরে সামন্তদের প্রধান আনন্দ ছিল শিকার। ভোজের সময় একটি আস্ত ষাঁড় বা শুয়োর পোড়ানো হইত। আমোদস্ফূর্তির মধ্যে ছিল ভাটচারণদের স্তুতিগান, সঙদের হাসিমস্করা আর মল্লবীরদের কুস্তি ও কসরত।

গ্রাম ও চাষী : সামন্তরা ছিল সংখ্যায় অল্প, বড় জোর মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচজন। ইহারা ও কিছু শহরবাসী ছাড়া বাকি সকলে ছিল চাষী। চাষীদের মধ্যে ছিল স্বাধীন কৃষক, বাকি সবাই ভূমিদাস। ইহারা সামন্ত বা জমিদারদের প্রজা। ইহারা

জমিদারের নিকট হইতে জমি ইজারা লইত আর জমিদারের বাড়িতে কিংবা খাস জমিতে খাটিয়া খাজনা শোধ করিত। স্বাধীন চাষী ও ভূমিদাসদের মধ্যে তফাত এই যে ভূমিদাসরা প্রভুর জমি ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। জমি হস্তান্তর হইলে তাহারাও হস্তান্তরিত হইত, যেন 'জমির সংলগ্ন গাছ বা পাথর।'



চাষী

বাস্তবপক্ষে তখনকার দিনে জমি ছাড়িয়া যাওয়া সহজ ছিল না। কোথায় যাইবে সর্বত্র দরিদ্র চাষীর দুরবস্থা। জমিদারের জমি চাষ, ফসল তোলা, গরুভেড়ার যত্ন, ঘরের কাজ, রাস্তাঘাট সারানো এই সব করিয়া নিজেদের জমি দেখিবার জন্য যথেষ্ট সময় মিলিত না। তার উপর তাহাকে প্রভুর কলে গম ভাঙিতে হইত, প্রভুর চুলায় রুটি সেঁকিতে হইত আর ইহার জন্য প্রভু খুশিমত ভাড়া আদায় করিত।

চাষীরা প্রভুর আশ্রয়ে গ্রামে বাস করিত, বাহিরের কোন খবর রাখিত না। গ্রামের জন্য যা যা দরকার সব গ্রামেই উৎপন্ন হইত। চাষাদের যার যার জোত ছিল আলাদা, কিন্তু জোতগুলি আল অথবা বেড়া দিয়া ভাগ করা হইত না। গ্রামের সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ হইত, জোত অনুসারে ফসল ভাগ হইত। চাষীর সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহার ছোট কাঠের অথবা পাথরের কুটির,

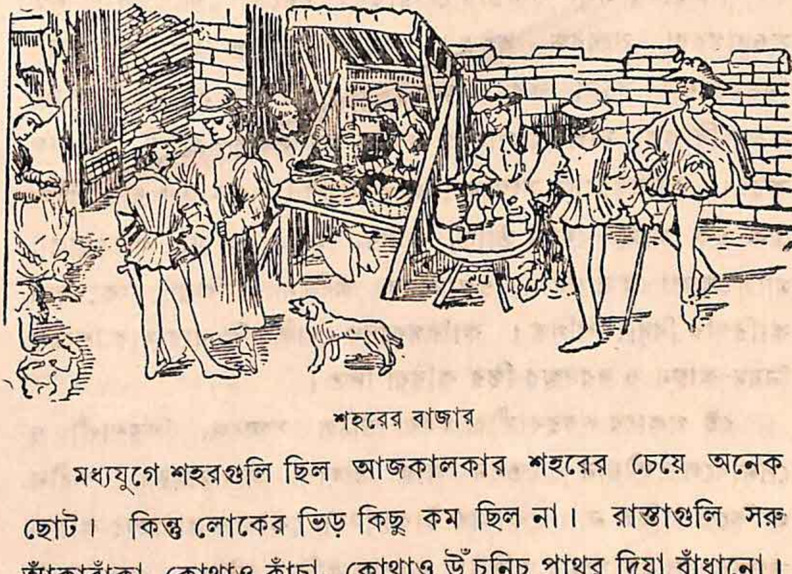
তাহাতে ছোট ছোট অয়েলক্লথের জানালা ; সামান্য কিছু মামুলী আসবাব, অবস্থা ভাল হইলে রান্নার জন্য একটি কড়াই, দু'চারটা শুয়োর, ভেড়া, ষাঁড়, একটা গাই আর বড় জোর একটি ঘোড়া। চাষীর প্রধান খাদ্য ছিল মোটা আটার রুটি, সিম ও অন্যান্য শাকসবজি, গ্রাম্য মদ আর শুয়োরের মাংস। শীতকালে ছিল খাওয়াদাওয়ার বড় অভাব। তখনকার জন্য চাষীরা প্রচুর লবণ দিয়া মাংস জমাইয়া রাখিত।

পুরুষদের মত মেয়েরাও খুব পরিশ্রম করিত। সারাদিন ধরিয়া তাহারা সুতা কাটিত ও কাপড় বুনিত। মেয়েপুরুষ সকলে পরিত সুতির, পশমের বা চামড়ার পোশাক। লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জীবনযাত্রা ছিল একান্ত একঘেয়ে, গতানুগতিক। গ্রামের গির্জায় গিয়া চাষীরা প্রার্থনা করিত ও পুরোহিতের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিত। ইহা ছাড়া গ্রামের জীবনে কোন প্রকার বৈচিত্র্য ছিল না।

শহর ঃ শহরের জীবন ছিল অন্যরকম। এখানকার লোক চাষ আবাদ করিত না, করিত কারিগরি ও কারবার। এখানকার হাটেবাজারে দূর দূর দেশের পণ্য আসিত। গ্রামগুলি যদিও ছিল মোটামুটি সাবলম্বী, তবুও কয়েকটি জিনিসের জন্য গ্রামবাসীদিগকে শহরে আসিতে হইত। যেমন লোহা, অস্ত্রশস্ত্র, লবণ, মসলা, তেল ইত্যাদি। চাষীরাও তাহাদের উৎপন্ন কিছু কিছু জিনিস শহরে বেচিয়া যাইত।

যেখানে মালপত্রের আনাগোনা এবং টাকাপয়সার লেনদেন হয় সেখানে শত্রুর ও চোর ডাকাতের নজর পড়িবেই। কাজেই সেকালে শহর-বন্দর গড়িয়া উঠিত কোন এক দুর্গের চারিদিকে, সামন্তের আশ্রয়ে। গোটা শহরটাই হইয়া দাঁড়াইত সামন্ত প্রভুর

অনুগত, প্রভুকে খাজনা দিত। পরে শহর ঘিরিয়া পুরু প্রাচীর তোলা হইত। প্রাচীরের মধ্যে ফটক থাকিত। শত্রু বা দস্যু শহর আক্রমণ করিলে সশস্ত্র রক্ষীরা ফটক বন্ধ করিয়া দিত আর প্রাচীরের উপর হইতে শত্রুকে বাধা দিত। শহরের ভিতরেও ছিল নানারকম হাঙ্গামা ও উপদ্রব। নাগরিকদের মধ্যে ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া প্রায়ই দাঙ্গা বাধিত। চোর ডাকাতরা রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত আর টহলদার পুলিশের চোখ এড়াইয়া পথিকের উপর উৎপাত করিত।



শহরের বাজার

মধ্যযুগে শহরগুলি ছিল আজকালকার শহরের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু লোকের ভিড় কিছু কম ছিল না। রাস্তাগুলি সরু আঁকাবাঁকা, কোথাও কাঁচা, কোথাও উঁচুনিচু পাথর দিয়া বাঁধানো। দুইদিকে চার-পাঁচতলা কাঠের বাড়ি, রাস্তায় আলোবাতাস আসিবার উপায় নাই। যেমন অন্ধকার তেমন দুর্গন্ধ আর হট্টগোল। ইহার মধ্য দিয়া ঘোড়সওয়ার, গাড়িওয়ালা ও পথিক ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া চলাচল করিত। বাড়িগুলিও ছিল ঘুপসি ও অস্বাস্থ্যকর।

দিনের বেলা জানালার কাঁচ দিয়া সামান্য আলো আসিত। রাত্রে মোমবাতি জ্বালিয়া অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা হইত। মাঝে মাঝে মড়ক লাগিয়া কিংবা আগুন ধরিয়া শহরের পর শহর উজাড় হইয়া যাইত।

সরাইখানা ছিল ভবঘুরেদের মাথা গুঁজিবার জায়গা। দিন ভরিয়া বাজারে আড্ডা চলিত, আর রাত্রের আড্ডা ও হল্লা হইত ভাঁটিখানায়। কখনও কখনও শহরে মেলা বসিত। নানা দেশ হইতে আসিত রকমারি জিনিস। বেচাকেনার ধুম পড়িয়া যাইত।

সামন্তদের জুলুম ও দস্যুর দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য সওদাগররা সঙ্ঘবদ্ধ হইত। সংহতির উদ্দেশ্য ব্যবসাবাণিজ্যের নিয়মকানুন রচনা করা, শুল্কের হার লইয়া সামন্তদের সঙ্গে দর কষাকষি করা, মালপত্র পাহারা দিবার জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিয়োগ করা। কারিগরদের সংগঠন ছিল আলাদা। এক এক বৃত্তি লইয়া এক এক গোষ্ঠী—যেমন তাঁতি, কুমার, মুচি, শুঁড়ি, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা ইত্যাদি। ওস্তাদদের অধীনে থাকিয়া সাক্‌রেদরা কারিগরি বিদ্যা শিখিত। কারিগরদের গোষ্ঠীগুলি যার যার শিল্পের নিয়ম-কানুন ও দরদস্তুর স্থির করিয়া দিত।

এই প্রকারে শহরবাসীরা হইয়া উঠিল সঙ্ঘবদ্ধ, বিত্তশালী ও সেনাবলে বলীয়ান। তখন আর তাহারা সামন্তপ্রভুর অধীন থাকিতে চাহিল না। কোথাও টাকা দিয়া, কোথাও বা জোর করিয়া তাহারা পৌরশাসনের অধিকার আদায় করিয়া লইল। প্রভু সনদ লিখিয়া দিল। শহরগুলি এই সনদের বলে একে একে স্বাধীনভাবে আইন করিবার, মুদ্রা, ফৌজ ইত্যাদি গড়িবার ক্ষমতা লাভ করিল। এমনি করিয়া ইটালীর ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, মিলান, জার্মানীর ল্যুবেক, হামবুর্গ প্রভৃতি নগর প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

এক একটি বর্ধিষ্ণু পরিবার এক এক নগররাষ্ট্রের রাজতক্ত অধিকার করিয়া বসিল।

চার্চ ও মঠ : কি গ্রামে কি শহরে খ্রীষ্টান যাজকদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সামন্তদের সমান। সমাজে লেখাপড়া জানা লোক বলিতে ছিল কেবল তাহারাই। আজকাল যেমন সরকারী কাজ চালাইবার জন্য জেলায় জেলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকে তখন তেমন লোকের ধর্মজীবনে পথ দেখাইবার জন্য পাদরী নিয়োগ করা হইত। পাদরী বা বিশপরা ছিল চার্চের নায়ক পোপের অধীনে। চার্চের কড়া নিয়ম ছিল তিনটি। প্রথম, বাধ্যতা। বিশপরা চার্চের নিয়ম মানিবে, পোপের বাধ্য হইবে। দ্বিতীয়, বৈরাগ্য। তাহারা ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিবে না, দীনভাবে নিরাসক্ত জীবন যাপন করিবে। তৃতীয় শুচিতা। তাহারা বিবাহ ও সংসার করিবে না, ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে।

তখন লোকের মনে ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশী। কাজেই বিশপদিগকে সকলে সমীহ করিত। তাহাদের ছিল অনেক কাজ। নিজ নিজ এলাকার গির্জায় প্রতি রবিবার তাহারা সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করিত, খ্রীষ্টমাস ঈষ্টার প্রভৃতি পালন করিত। তাহারা লোককে দীক্ষা দিত, পাপার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিত, মুমূর্ষুর মুখ হইতে পাপের স্বীকারোক্তি শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিত। জন্ম, নামকরণ, বিবাহ, পারলৌকিক কাজ ইত্যাদি ব্যাপারে যাজক না হইলে চলিত না। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে ঝগড়াবিবাদ সালিসী করিতে হইত, চার্চের সম্পত্তির হিসাব রাখিতে হইত।

যাজকদের মধ্যে একদল ছিল সন্ন্যাসী। তাহারা লোকালয় হইতে দূরে মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে বাস করিত। পুরুষ ও

মেয়েরা থাকিত আলাদা মঠে। তাহাদিগকে কঠোর নিয়মকানুন মানিয়া মঠের অধিনায়ক বা অধিনায়িকার তত্ত্বাবধানে বাস করিতে হইত। সন্ন্যাসীরা আলস্যে দিন কাটাইত না। তাহারা মঠের বাগানে ও ক্ষেতে কাজ করিত, হাসপাতাল ও স্কুল চালাইত।



সন্ন্যাসীরা মঠে প্রার্থনা করিতেছে

অতিথি-সৎকার ও দরিদ্র সেবা ছিল পালনীয় কর্তব্য। সন্ন্যাসী-দিগকে আহারে বিহারে ও বাক্যে সংযম পালন করিতে হইত। পাঠ, প্রার্থনা ও সাধন-ভজন ছিল দৈনন্দিন কর্ম। কোন কোন মঠের সন্ন্যাসীরা দীনদরিদ্রভাবে জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম প্রচার করিত। তাহাদিগকে বলিত 'ফ্রায়ার' বা ভ্রাতৃদল।

চার্চ ও মঠগুলি পরে আর তাহাদের বৈরাগ্য রক্ষা করিতে পারে নাই। চারিদিককার অরাজকতার মধ্যে এগুলিও সামন্তপ্রথার আওতায় পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাদের ছিল প্রচুর জমি। জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করিয়া তাহার খাজনা হইতে ইহার খরচ চালাইত। তার উপর পুণ্যলাভের আশায় অনেকে চার্চে ও মঠে সম্পত্তি দান করিত। এইরূপে যাজকদের মধ্যে ক্রমশঃ

আলস্য, লোভ ও দুর্নীতি প্রবেশ করিল। কিন্তু মধ্যযুগের সভ্যতায় তাহাদের দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই যুগে ইয়োরোপে সামান্য যেটুকু জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা হইত তা' মঠে ও গির্জায়। তখনকার অরাজকতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের হাত হইতে অনেক প্রাচীন পুঁথি মঠগুলির আশ্রয়ে রক্ষা পাইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মঠে ও গির্জার স্কুলগুলিতে শিখানো হইত ধর্মের কথা আর কিছু সাহিত্য ও ব্যাকরণ। শহরের স্কুলে ছাত্রেরা শিখিত ব্যবসা ও কারিগরি। ক্রমে আরও নানা বিষয়ে শিক্ষার চাহিদা হইল,—যেমন দর্শন, আইন, চিকিৎসা, রাজকার্য। এই চাহিদা মিটাইল বিশ্ববিদ্যালয়।

যে বিদ্যালয়ে দেশবিদেশের ছাত্র পড়িতে আসে তাহাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। আজকাল আগে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তারপর ছাত্ররা পড়িতে আসে। তখনকার দিনে ছিল ইহার বিপরীত। হয়ত কোন মঠে বা গির্জায় কিংবা কোন শহরে একজন নামকরা আচার্য আছেন। খবর পাইয়া দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রীরা আসিয়া তাঁহার চারিদিকে জমা হইল। শিক্ষার উন্নতির জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন আচার্য জোট বাঁধিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহাদের সঙ্গে জুটিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠিল ঘরবাড়ি। এইরূপে গড়িয়া উঠিল বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি—অর্থাৎ যেখানে সবাই মিলিয়া এক।

ছাত্র ও শিক্ষকরা অধিকাংশ আসিত বিদেশ হইতে। বিদেশীরা ছিল নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। সুতরাং জোট বাঁধিবার ছিল নিতান্ত প্রয়োজন। এক এক দেশ হইতে আগত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্ঘ গঠন করিত। এই সঙ্ঘগুলিকে বলিত 'নেশন'। কোথাও কোথাও শিক্ষকরাও নেশনে যোগ দিতেন। শহরগুলি

যেমন রাজা ও সামন্ত প্রভুর হাত হইতে পৌরশাসনের অধিকার আদায় করিয়াছিল, নেশনগুলিও তেমন শহরের কাছ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বায়ত্ত শাসন আদায় করিয়া লইল। তাহাদিগকে খাজনা দিতে হইত না, যুদ্ধে যাইতে হইত না, ঝগড়াবিবাদ হইলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদালতে মামলা মিটাইত। পরে এই নেশনগুলি কলেজে পরিণত হইল।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল ইয়োরোপ-জোড়া খ্যাতি। প্যারি ছিল ধর্মশাস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ, স্যলের্নোর নাম ছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর বোলোনার বিশেষত্ব ছিল আইনবিদ্যায়।



বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস

ছাত্রদের পড়িবার জন্য ছিল অল্পস্বল্প বই লইয়া ছোটখাট গ্রন্থাগার। পরে রাত্রে ঘুমাইবার জন্য শয়নঘরের বন্দোবস্ত হয়। ভোর হইতে ক্লাস বসিত। বইপত্র তখন বিশেষ পাওয়া যাইত না। ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিত আর নোট করিত। বক্তৃতা হইত ল্যাটিন ভাষায়। খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল না। এক একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিল ছেলেমেয়ে লইয়া দশ বিশ হাজার ছাত্র। সকলেরই যে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ ছিল তা নয়। অনেক ধনীর দুলাল আসিত কাপ্তানি করিতে এবং বহু গুণ্ডা-বদমাশও আসিয়া জুটিত। নেশনগুলির মধ্যে ছিল রেষারেষি,—এক এক সময় ক্লাসঘরেই মারামারি লাগিয়া যাইত। মাঝে মাঝে শহরবাসীদের সঙ্গে

বাধিত দাঙ্গা, তখন ছাত্ররা হইত একতাবদ্ধ। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে গর্ব অনুভব করিত। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য এক রকম স্বতন্ত্র পোশাকের প্রচলন হইল,—টুপি ও গাউন। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্ররা এই পোশাক পরে।

মনোযোগী ছাত্ররা লেখাপড়া শিখিবার জন্য প্রচুর কষ্ট স্বীকার করিত। তাহারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত,—হয়ত দু'বছর প্যারীতে, তারপর এক বছর অক্সফোর্ডে, এক বছর বোলোমায়। এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখিত এক এক বিদ্যা আর দেশবিদেশে ঘুরিয়া লাভ করিত অভিজ্ঞতা। কাজ করিয়া, ভিক্ষা করিয়া কিংবা গান গাহিয়া তাহারা পাথেয় ও পড়ার খরচ সংগ্রহ করিত, কখন কখন আবার চোরডাকাতের হাতে পড়িত।

সংস্কৃতি : শিক্ষার ধরন আজকালকার মত ছিল না। তখন ছিল আগে বিশ্বাস তারপর জিজ্ঞাসা। বাইবেলের কথা যেমন মিথ্যা হইতে পারে না, তেমন এরিস্টটল্-এর মতও অভ্রান্ত। প্রথম আপ্তবাক্য মানিয়া লইতে হইবে, তারপর তাহার সমর্থনে যুক্তি খুঁজিতে হইবে, ইহাই ছিল গবেষণার রীতি। কোন কোন আচার্য ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্যারীর অধ্যাপক পিটার এবেলার্ড। তিনি বলিতেন আগে প্রশ্ন তারপর বিশ্বাস। যুক্তিতে টিকিলেই তবে মত গ্রাহ্য হয়। সুতরাং সকলের আগে প্রশ্ন জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। এই মতের বিরুদ্ধে ছিলেন এলবার্ট ও একুইনাস্—গুরু ও শিষ্য। একুইনাসের বিখ্যাত পুস্তক "ধর্মশাস্ত্রের নির্ঘণ্ট" সে যুগের ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানবিদ্যার প্রামাণ্য সঙ্কলন। তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে

যুক্তির, ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সামঞ্জস্য ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড ও প্যারীর অধ্যাপক রোজার বেকন ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, একদিন যন্ত্রের বলে মানুষ আকাশে উড়িবে, তীরবেগে গাড়ি হাঁকাইবে ও জাহাজ চালাইবে। এসব কথা শুনিয়া এবং তাঁহার কীর্তিকলাপ দেখিয়া লোকে মনে করিত যে তাঁহার সঙ্গে দৈত্যদানবের যোগাযোগ আছে। চার্চের কর্তারাও এসব পছন্দ করিতেন না। বেকনের চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড হইল।

শিক্ষা, শাস্ত্রচর্চা, গ্রন্থরচনা, সবই হইত ল্যাটিন ভাষায়। ক্রমে কথ্য ভাষারও উন্নতি ও প্রচলন হইতে লাগিল। সে যুগের বীরত্বপূর্ণ উপকথা অবলম্বন করিয়া চারণ কবিরা দেশীয় ভাষায় গান বাঁধিত ও গাহিয়া বেড়াইত। ফ্রান্সের ক্রবাদুররা ফরাসী ভাষায় গাহিত রাজা আর্থার ও তাঁহার বীর নাইটদের কাহিনী, শার্লামেন ও রোল্যাণ্ডের গাথা, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ও ট্রয়যুদ্ধের গল্প। জার্মানীর মিনেসিংগারেরা গাহিত প্রেমের কবিতা। ফ্লোরেন্সের কবি দান্তে ইটালীয় ভাষায় লিখিলেন 'ডিভাইন কমেডি' নামে এক মহাকাব্য। ইহাতে আছে মধ্য যুগের জীবন ও চিন্তাধারার আলেখ্য। ইংরাজীতে লেখা হইল রবীনহুডের রোমাঞ্চকর উপন্যাস আর চসারের হাতে সৃষ্টি হইল 'ক্যান্টারবেরির গল্প'। বত্রিশ জন তীর্থযাত্রী ক্যান্টারবেরি যাইবার পথে এক এক করিয়া গল্প বলিতেছে, আর গল্পের ভিতর দিয়া তাহাদের চরিত্র ও ইংলণ্ডের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির আর একটি অঙ্গ উৎকর্ষ লাভ করিল। ইয়োরোপ ভরিয়া নির্মিত হইল নানা আকৃতির গির্জা। প্রথম প্রথম গির্জা নির্মিত হইত রোমান স্থাপত্য-শিল্পের অনুকরণে।

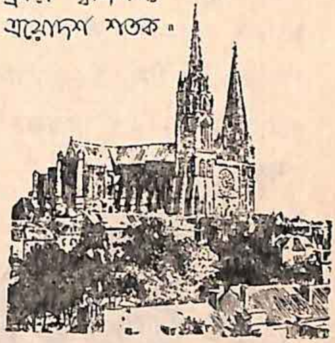
পিসার গির্জ্জা

ওহেলানো মিনার
ইতালী-একাদশ ও
দ্বাদশ শতক।



শার্তের গির্জ্জা

ফ্রান্স দ্বাদশ ও
ত্রয়োদশ শতক।



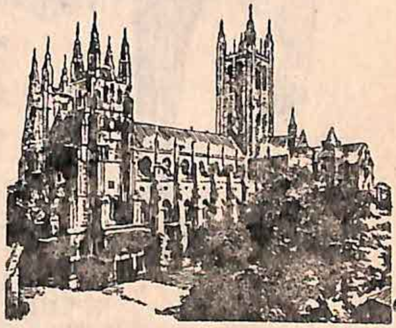
সেন্ট চ্যাপেল গির্জ্জা

ফ্রান্স-ত্রয়োদশ
শতক



ক্যান্টারবেরীর গির্জ্জা

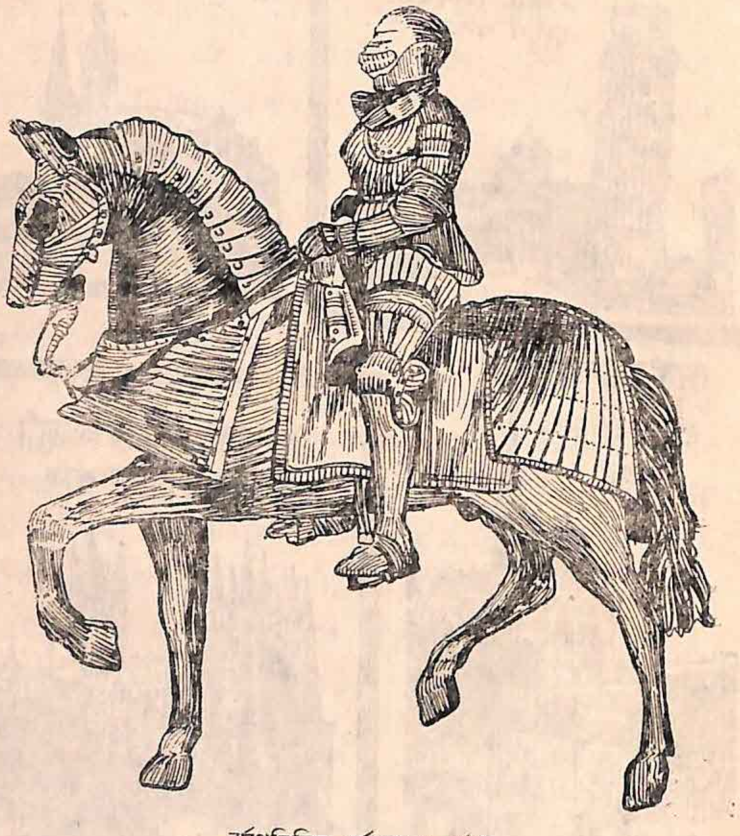
ইংলণ্ড-সপ্তম শতক



পিসার গির্জা রোমান স্থাপত্যের অন্যতম নির্দশন : গোলাকার খিলান ও চূড়া এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। শার্তের ও সেণ্ট চ্যাপেলের গির্জা গথিক স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত, ইহাতে খিলান ও চূড়া কোনাচে এবং লম্বা।

পরে এক নূতন স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হইল। ইহাকে বলে গথিকরীতি। অবশ্য গথদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

ধর্মযুদ্ধ : মুসলমানদের তীর্থস্থান যেমন মক্কা, খ্রীষ্টানদের



বর্মপরিহিত ধর্মযোদ্ধা নাইট

তীর্থস্থান তেমন জেরুসালেম। সপ্তম শতকে এই পবিত্র নগরী আরব মুসলমানদের হস্তগত হইল। আরবরা খ্রীষ্টানদের ধর্মাচরণে বাধা দিত না। এগার শতকে সলজুক তুর্ক নামে এক তাতার

জাতি তুর্কীস্তান হইতে আসিয়া আরবদের এশিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। তুর্করা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহারা জেরুসালেমের তীর্থ যাত্রীদের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিত না। ইহাতে খ্রীষ্টানদের ধর্মভাবে আঘাত লাগিল। ইয়োরোপে রব উঠিল বিধর্মীদের হাত হইতে পবিত্র প্যালেস্টাইন দেশ ও জেরুসালেম নগরী উদ্ধার করিতে হইবে।

উপকথায় আছে যে পীটার নামে এক সন্ন্যাসী জেরুসালেমে তীর্থ করিতে গিয়া সচক্ষে খ্রীষ্টানদের লাঞ্ছনা দেখিয়া আসিলেন এবং যীশুখ্রীষ্টের আদেশ পাইয়া তিনি খ্রীষ্টানদিগকে ধর্মভূমি উদ্ধার করিবার জন্য মাতাইয়া তুলিলেন আসলে খ্রীষ্টানদিগকে ধর্মযুদ্ধে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন পোপ দ্বিতীয় আর্‌বান। তাঁহার নির্দেশ পাইয়া ক্রুশচিহ্নিত পতাকা হাতে নাইটরা দলে দলে চলিল প্যালেস্টাইনের দিকে। অর্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা লইয়া তুর্ক মুসলমানরা রুখিয়া দাঁড়াইল। লড়াই ও বিরতির মধ্যে দিয়া দু'শ বছর ধরিয়া চলিল এই ধর্মযুদ্ধ।

প্রথম অভিযানে খ্রীষ্টানরা জয়লাভ করিয়া প্যালেস্টাইনে ধর্মরাজ্য স্থাপন করে। প্রায় একশ' বছর পরে তুর্করাজ সলাদিন জেরুসালেম পুনরায় দখল করিয়া লইলেন। তখন তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ডের রাজারা। জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা পথে এক নদীতে জাহাজডুবি হইয়া প্রাণ হারাইলেন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড সীরিয়ায় পৌঁছাইলেন। ফিলিপ ঝগড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রিচার্ড যুদ্ধ করিয়া প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু জেরুসালেম মুসলমানদের হাতে রহিয়া গেল। তিনি সলাদিনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া দেশে ফিরিলেন।

রিচার্ডের বীরত্বের জন্য ইয়োরোপবাসীরা তাঁহাকে বলিত 'সিংহবিক্রম রিচার্ড'। সলাদিন কর্মবীর ও সাহসী ছিলেন না। খ্রীষ্টান রাজামহারাজাদের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক বেশী শিক্ষিত ও ভদ্র। এই দুই বীরপুরুষ শত্রু হইলেও পরস্পরকে সম্মান করিতেন, একজনের তাঁবুতে গিয়া আর একজন আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। একবার রিচার্ড অসুস্থ হইয়া পড়িলে পর সলাদিন তাঁহাকে দেশের বাছা বাছা ফল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর একবার যুদ্ধে খ্রীষ্টান নায়কের ঘোড়া নিহত হইতে দেখিয়া সুলতান তাঁহাকে একটি সুন্দর আরবী ঘোড়া উপহার দেন।



সিংহবিক্রম রিচার্ড

শেষ পর্যন্ত ধর্মভূমি উদ্ধার হইল না বটে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা আরব ও তুর্কদের সংসর্গে আসিয়া সভ্য হইয়া উঠিল। ভূমধ্যসাগরের পথে এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ঘনীভূত হইল। ইয়োরোপীয়রা নূতন আদব-কায়দা শিখিল, জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পাইল। প্রথম দিকে তীর্থযাত্রীরা হইয়াছিল যোদ্ধা। শেষদিকে যোদ্ধারা হইয়া উঠিল শিক্ষার্থী। সভ্যতার বিস্তারে ধর্মযুদ্ধের ইহাই অবদান।

পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কজাতি : সপ্তম শতকে আরবরা ইস্‌লামের যাদুমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারত সীমান্ত হইতে স্পেন পর্যন্ত ভূখণ্ড জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। একশ' বছরের মধ্যে এই বিরাট সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। স্পেনে মূররা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিল; তুর্কীস্তানে তুর্করা স্বাধীন হইয়া বসিল। অষ্টম শতকে স্পেনে এবং দশম শতকে মিশরে দুই নূতন খলিফার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বোগ্‌দাদ, কায়রো ও কর্ডোভায় তিন খলিফার রাজত্ব চলিল। প্রাচ্য প্রদেশগুলিও আর বোগ্‌দাদের খলিফার অধিকারে রহিল না। সেখানে অধিষ্ঠিত হইল কয়েকটি পারসীক ও তুর্ক রাজবংশ। কিছুদিনের মধ্যে তুর্করা আসিয়া তুর্কীস্তান হইতে মিশর পর্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যদেশ ছাইয়া ফেলিল। পাঁচশ' বছর পূর্বে জার্মানরা আসিয়া দুর্বল রোমসাম্রাজ্য ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। রোমের নিকট হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা ছোট ছোট জার্মান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তুর্করাও তেমনি জরাজীর্ণ আরব সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহারা আরবদের ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর কয়েকটি তুর্করাজ্য স্থাপন করিল।

আফগানিস্তানের গজনী ছিল এমনি একটি তুর্করাজ্য। আলপ্তিগীন নামে এক ভাগ্যান্বেষী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন গজনীর রাজা হইয়া কয়েকবার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তাঁহার

পুত্র মামুদ বার বার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের পূর্বপ্রান্ত, তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও পঞ্জাব জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। বোগ্‌দাদের খলিফার কাছ হইতে গজনীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ করিয়া তিনি 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিলেন।

এমন সময়ে তুর্কীস্তানের প্রান্তর হইতে বন্যার স্রোতের মত আসিল আর এক তুর্ক জাতি। ইহাদের প্রাচীন দলপতি সলজুকের নামানুসারে ইহাদিগকে বলা হয় সলজুক তুর্ক। তুর্কপ্লাবনে বোগ্‌দাদ সাম্রাজ্য ডুবিয়া গেল। দিগ্বিজয়ী তুর্ক সম্রাট তুঘ্‌রিল পারসীক উজির-ওমরাহ দিয়া শাসনকার্য চালাইতেন। প্রান্তরচারী অশিক্ষিত যাযাবররা কয়েক বছরের মধ্যে সভ্য হইয়া উঠিল। সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাহাদের অবদান অবহেলার যোগ্য নয়। বোখারার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মধ্য এশিয়ার রত্ন। বিচক্ষণ উজির নিজাম-উল্-মুলক্-এর 'সিয়াসৎনামা' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক মূল্যবান গ্রন্থ। ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়ত' আজও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কাব্যের মতই তাঁহার প্রতিভা ছিল গণিত ও নভোবিজ্ঞানে। রিচার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী সলাদিন ছিলেন সলজুক রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি। মিশর ও সীরিয়া লইয়া ছিল তাঁহার রাজ্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি, উদারতা ও সমরকুশলতা তাঁহার চরিত্রকে করিয়াছিল ইয়োরোপের আদর্শস্থানীয়।


সলাদিন

কাস্পিয়ান সাগর ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর একটি তুর্করাজ্যের উদ্ভব হয়। সলজুকদের এক কর্মচারী এই রাজ্য স্থাপন করিয়া খ্বারিজম্ শাহ উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের রাজারা সলজুকদের হাত হইতে তাহাদের রাজ্যের পূর্বাঞ্চল কাড়িয়া লন। আফগানিস্তানের এক পারসীক যুবক ঘোর নামে আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেন। ঘোররাজ প্রথমে ছিলেন খ্বারিজম্ শাহদের অধীন। বার শতকে ঘোররা স্বাধীন হয় এবং গজনী অধিকার করে।

ভারতে আরব ও তুর্ক ঃ ৭১২ সালে মোহম্মদ বিন্ কাসিম নামে এক আরব সেনাপতি সিন্ধু ও মূলতান জয় করিয়া খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্ধুরাজ দাহির তাঁহার হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর দীর্ঘকাল এখানে আরব রাজত্ব চলে। স্পেনের মত এখানেও আরবরা উদারভাবে দেশশাসন করিত, ভারতীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের চর্চা করিত। ইহাদেরই মাধ্যমে ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ পাশ্চাত্য জগতে বিস্তার লাভ করে। নবম শতকে আরবদের পতনের সময়ে সিন্ধুরাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায় ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

দশম শতকে গজনীর তুর্করাজ সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন। তখন কাশ্মীর ও পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন জয়পাল। তাঁহার সহিত সবুক্তগীনের বার বার যুদ্ধ হয়। ইহার পর আসিলেন সুলতান মামুদ। ১০০১ সাল হইতে পঁচিশ বছর ধরিয়া জয়পাল ও তাঁহার বংশধররা মামুদ ও দুর্দান্ত তুর্ক বাহিনীকে বাধা দিলেন। অবশেষে পঞ্জাব গজনীর অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু মামুদের সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ভারতবর্ষের ধনদৌলতের প্রতি ছিল তাঁহার লোভ। তিনি সতের বার এদেশের বিভিন্ন স্থান

আক্রমণ করিয়া বহু নগর, তীর্থস্থান ও মন্দির লুঠ করেন। কিন্তু তিনি অসভ্য বর্বর ছিলেন না। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন। বিদ্যায়, সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁহার অনুরাগ ছিল; তাঁহারই সঙ্গে আরব পণ্ডিত অল্‌বিরুনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছিলেন এবং এদেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহার দেড়শ' বছর পরে আসিলেন ঘোর-সেনাপতি মোহম্মদ বা মোহম্মদ ঘোরী। মামুদের মত তিনি লুণ্ঠন করিতে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে। ঘোরী পঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন। তখন উত্তর ভারতের আর এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন কনৌজের জয়চন্দ্র। পৃথ্বীরাজের প্রতি তাঁহার ছিল ঈর্ষা। তিনিও রাজপুত। রাজপুত বীরদের প্রথানুসারে পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইহাতে উভয়ের শত্রুতা আরও বাড়িয়া গেল।

১১৯১ সালে থানেশ্বরের নিকট তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ মোহম্মদকে পরাস্ত করিলেন। পরের বছর মোহম্মদ ঘোরী সৈন্য সমাবেশ করিয়া একই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র কোন যুদ্ধেই পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিতে আসিলেন না। এবার রাজপুত সেনা পরাস্ত হইল। পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া তুর্করা হত্যা করিল। কয়েক বছরের মধ্যে ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবক সারা আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন। মোহম্মদ ঘোরীর নির্দেশে তিনি হইলেন এই বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা। প্রভুর মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন স্বাধীন হইয়া দিল্লীতে প্রথম মুসলিম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

দিল্লীর সুলতানী ঃ কুতবউদ্দীন এবং পরবর্তী সুলতানরা 'দাস-রাজা' নামে পরিচিত। ইহার কারণ কুতবউদ্দীন নিজে এবং এই রাজবংশের রাজাদের মধ্যে আরও কয়েকজন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পরে সাহস ও যোগ্যতার বলে তাঁহারা ক্ষমতা লাভ করেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে সরাইয়া সুলতান হইলেন ইলতুৎমিস। ইনিও ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁহার বীরত্ব ও কার্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া কুতবউদ্দীন তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন এবং তাঁহার উপর বদায়ুনের শাসন ভার অর্পণ করেন। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভে পঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা প্রভৃতি দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি সর্বত্র বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীর প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিলেন। তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বোগ্‌দাদের খলিফা তাঁহাকে অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

ইলতুৎমিসের পুত্রেরা ছিলেন অকর্মণ্য। তিনি কন্যা রিজিয়াকে রাজকার্যে শিক্ষা দিয়া দিল্লীর মসনদের জন্য মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ওমরাহরা স্ত্রীলোকের শাসনে থাকিতে চাহিল না। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রকে তাহারা মসনদে বসাইল। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। তখন বাধ্য হইয়া তাহারা রিজিয়াকে সুলতানা করিল। রিজিয়া পুরুষের পোশাক পরিয়া দরবারে বসিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনা করিতেন, মাথায় ঘোমটা দিতেন না। মুসলমান সমাজ এসব পছন্দ করিত না। ইহার উপর তিনি একজন হাব্‌শী কর্মচারীর প্রতি পক্ষপাত দেখাইলেন। ইহাতে ওমরাহরা ঈর্ষান্বিত হইয়া বিদ্রোহ করিল। রিজিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। রিজিয়া ছিলেন সাহসী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও সুশাসিকা। পুরুষরা নারীর কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া এত গুণ কোন কাজে লাগিল না।

আক্রমণ করিয়া বহু নগর, তীর্থস্থান ও মন্দির লুঠ করেন। কিন্তু তিনি অসভ্য বর্বর ছিলেন না। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন। বিদ্যায়, সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁহার অনুরাগ ছিল ; তাঁহারই সঙ্গে আরব পণ্ডিত অল্‌বিরুনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছিলেন এবং এদেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহার দেড়শ' বছর পরে আসিলেন ঘোর-সেনাপতি মোহম্মদ বা মোহম্মদ ঘোরী। মামুদের মত তিনি লুণ্ঠন করিতে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে। ঘোরী পঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন। তখন উত্তর ভারতের আর এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন কনৌজের জয়চন্দ্র। পৃথ্বীরাজের প্রতি তাঁহার ছিল ঈর্ষা। তিনিও রাজপুত। রাজপুত বীরদের প্রথানুসারে পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইহাতে উভয়ের শত্রুতা আরও বাড়িয়া গেল।

১১৯১ সালে থানেশ্বরের নিকট তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ মোহম্মদকে পরাস্ত করিলেন। পরের বছর মোহম্মদ ঘোরী সৈন্য সমাবেশ করিয়া একই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র কোন যুদ্ধেই পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিতে আসিলেন না। এবার রাজপুত সেনা পরাস্ত হইল। পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া তুর্করা হত্যা করিল। কয়েক বছরের মধ্যে ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবক সারা আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন। মোহম্মদ ঘোরীর নির্দেশে তিনি হইলেন এই বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা। প্রভুর মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন স্বাধীন হইয়া দিল্লীতে প্রথম মুসলিম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

দিল্লীর সুলতানী : কুতবউদ্দীন এবং পরবর্তী সুলতানরা 'দাস-রাজা' নামে পরিচিত। ইহার কারণ কুতবউদ্দীন নিজে এবং এই রাজবংশের রাজাদের মধ্যে আরও কয়েকজন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পরে সাহস ও যোগ্যতার বলে তাঁহারা ক্ষমতা লাভ করেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে সরাইয়া সুলতান হইলেন ইলতুৎমিস। ইনিও ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁহার বীরত্ব ও কার্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া কুতবউদ্দীন তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন এবং তাঁহার উপর বদায়ুনের শাসন ভার অর্পণ করেন। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভে পঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা প্রভৃতি দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি সর্বত্র বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীর প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিলেন। তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বোগ্‌দাদের খলিফা তাঁহাকে অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

ইলতুৎমিসের পুত্রেরা ছিলেন অকর্মণ্য। তিনি কন্যা রিজিয়াকে রাজকার্যে শিক্ষা দিয়া দিল্লীর মসনদের জন্য মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ওমরাহরা স্ত্রীলোকের শাসনে থাকিতে চাহিল না। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রকে তাহারা মসনদে বসাইল। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। তখন বাধ্য হইয়া তাহারা রিজিয়াকে সুলতানা করিল। রিজিয়া পুরুষের পোশাক পরিয়া দরবারে বসিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনা করিতেন, মাথায় ঘোমটা দিতেন না। মুসলমান সমাজ এসব পছন্দ করিত না। ইহার উপর তিনি একজন হাব্‌শী কর্মচারীর প্রতি পক্ষপাত দেখাইলেন। ইহাতে ওমরাহরা ঈর্যান্বিত হইয়া বিদ্রোহ করিল। রিজিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। রিজিয়া ছিলেন সাহসী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও সুশাসিকা। পুরুষরা নারীর কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া এত গুণ কোন কাজে লাগিল না।

রিজিয়ার পর তাহার এক অকর্মণ্য ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র পর পর সিংহাসনে বসিলেন। বিদ্রোহ ও অশান্তি বাড়িতে বাড়িতে অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন ওমরাহরা রিজিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন মামুদকে সিংহাসনে বসাইলেন। নাসিরুদ্দিন ছিলেন ধর্মপ্রবণ ও শান্তিপ্রিয়। তিনি কোরাণ নকল করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে ফকিরের মত দীনভাবে বাস করিতেন। সুদক্ষ মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি ধর্মকর্মে ও জ্ঞান-বিদ্যার আলোচনায় সময় কাটাইতেন।

কুতবউদ্দীন ও ইলতুৎমিসের মত বলবনও ছিলেন ক্রীতদাস। সাহস ও বুদ্ধির বলে ইলতুৎমিসকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি পদোন্নতি লাভ করেন। নাসিরুদ্দীন তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে প্রধান সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান। সুলতান হইয়া তিনি উচ্চাভিলাষী ষড়যন্ত্র-পরায়ণ ওমরাহদের ক্ষমতা চূর্ণ করিলেন, দৃঢ়হস্তে দস্যু ও বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিলেন। তাঁহার কঠিন শাসনে দেশবাসী শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়-বিচার লাভ করিল। তাঁহার দরবার ছিল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আসর।

দাসরাজাদের প্রধান কীর্তি সুলতানীর শক্তিবৃদ্ধি ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ। সুলতানদের চেষ্টায় রাজন্যবর্গের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, মোঙ্গল বিভীষিকা হইতে দেশ রক্ষা পাইল। তখন মোঙ্গলের পদভরে সমস্ত এশিয়া মহাদেশ ও অর্ধ ইয়োরোপ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। অতএব দাসরাজাদের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না।

বল্‌বনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে দাসবংশের অবসান হইল। দিল্লীর মসনদে আরোহণ করিল খল্‌জী বংশ।

এই বংশের সবচেয়ে পরাক্রান্ত সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন। তিনি একে একে গুজরাট, রাজপুতনা ও মালব অধিকার করিলেন। কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও আসাম ব্যতীত সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার করায়ত্ত হইল। তাঁহার সুদক্ষ সেনাপতি মালিক কাফুর চারবার দক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া দেবগিরি, বরঙ্গল, দোরসমুদ্র ও [illegible]া নামক রাজ্যগুলি জয় করিয়া আসিলেন। অবশিষ্ট রহিল দক্ষিণে সমুদ্রপ্রান্তে ক্ষুদ্র পাণ্ড্যরাজ্য। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। আলাউদ্দীন কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করিলেন। যুদ্ধের ও শাসনের খরচ চালাইবার জন্য তাঁহাকে খাজনা বাড়াইতে হইল। সেই সঙ্গে তিনি দরকারী জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দিলেন। ইহাতে সেনা-বাহিনীর খরচ বাঁচিল। আজকাল মূল্যনিয়ন্ত্রণ সকল দেশে চলিতেছে। সেকালে ইহা ছিল সম্পূর্ণ নূতন।



আলাউদ্দীন খল্‌জী

আলাউদ্দীন ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও অসমসাহসী যোদ্ধা। কিন্তু তিনি কাহারও ভালবাসা পান নাই। তিনি ভয় দেখাইয়া ও জোর করিয়া প্রজাদিগকে বশে রাখিতেন। স্নেহময় পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে নির্যাতন করিয়া তিনি সুলতান হইয়াছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তিনিও মৃত্যুর আগে স্ত্রীপুত্রের নিকট হইতে অপসারিত হইলেন এবং প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুরের হাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর চার বছর পরে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত হইল তুঘলুক বংশ। এই বংশের সুলতান ছিলেন মোহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, প্রতিভাশালী কবি, নিষ্ঠাবান ও দানশীল। মদ্যপান ও বিলাসিতার দোষ তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন বড় খামখেয়ালী। তিনি আলাউদ্দীনের মতই নিষ্ঠুর ছিলেন কিন্তু আলাউদ্দীনের মত বিচারবুদ্ধি তাঁহার ছিল না।



মোহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক

প্রথমে সুলতানের খেয়াল হইল যে রাজধানী দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে সরাইয়া লইবেন। দিল্লীবাসীদিগকে জোর করিয়া দেবগিরি লইয়া যাওয়া হইল। কষ্ট ও খরচের একশেষ। কিন্তু সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশ শাসন করা ও পঞ্জাবে মোঙ্গল আক্রমণ ঠেকানো যায় না। সুলতানের মন বদলাইল। সকলকে আবার দিল্লীতে ফিরিতে হইল।

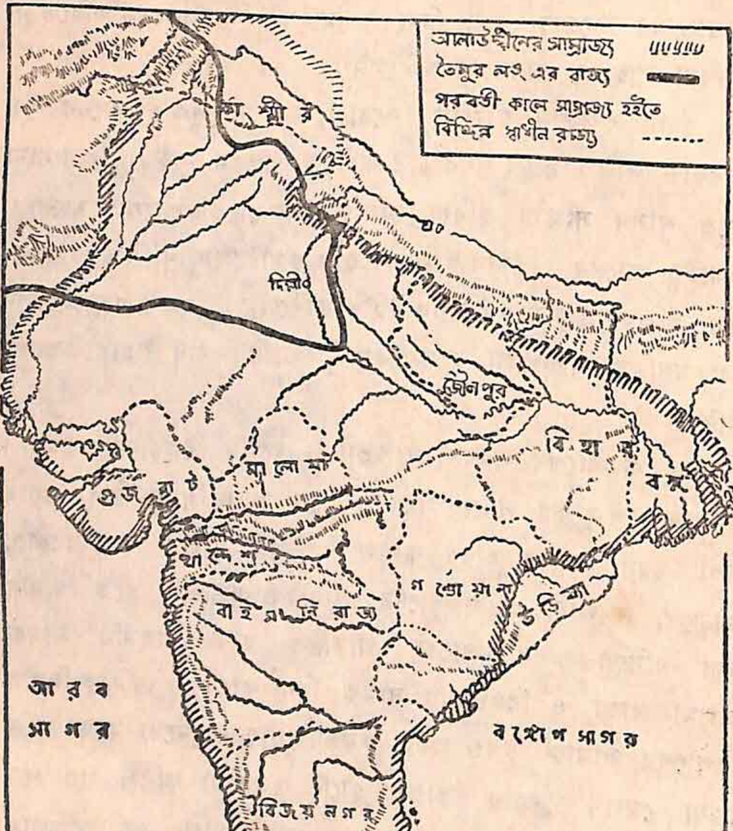
মোঙ্গলদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মোহম্মদ তাহাদিগকে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়া বিদায় করিলেন। রাজকোষে ঘাটতি পড়িল। মোহম্মদ তামার নোট চালাইলেন। জুয়াচোরেরা এই নোট জাল করিয়া বাজারে চালাইতে লাগিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। মোহম্মদ বাধ্য হইয়া তামার নোট তুলিয়া লইলেন। সকলকে নোটের দাম দিতে গিয়া রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া গেল

কঠোর শাসনের চাপে এবং এই সমস্ত খামখেয়ালীর ফলে সাম্রাজ্যময় বিদ্রোহ দেখা দিল। মোহম্মদ বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এবার সুলতান হইলেন ফিরোজ শাহ্ তুঘ্লুক। অনেক যুদ্ধ করিয়াও তিনি সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। কিন্তু নানা দিকে শাসন সংস্কার করিয়া তিনি ভগ্ন সাম্রাজ্যে শান্তি ও সচ্ছলতা ফিরাইয়া আনেন। তিনি রাজস্বের হার কমাইলেন, শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করিলেন, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিলেন। নূতন শহর স্থাপন এবং মসজিদ, পান্থশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

তুঘ্লুক বংশের পরবর্তী সুলতানরা ছিলেন একেবারে অকমণ্য। মোহম্মদ তুঘ্লুকের সময়ে সাম্রাজ্যে যে ভাঙন ধরিয়াছিল এবার তাহা চরম আকার ধারণ করিল। উত্তর ভারতে বঙ্গ, বিহার, জৌনপুর, মালোয়া ও গুজরাটের শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীন হইয়া বসিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল বাহমনি নামক মুসলমান রাজ্য ও বিজয়নগর নামক হিন্দু রাজ্য। এদিকে দিল্লীর চারপাশের সামান্য ভূখণ্ড লইয়া ক্ষমতাপিপাসুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। দিল্লীর ভাঙ্গা হাটে সুলতানী করিল পর পর সৈয়দ নামে এক আরব বংশ ও লোদী নামে এক আফগান বংশ।

ইতোমধ্যে দুর্বল তুঘ্লুকদের আমলে উল্কার মত অবতীর্ণ হইলেন তুর্ক হানাদার তৈমুর লঙ্। পঞ্জাব বিধ্বস্ত করিয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলেন, বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীনগরী শ্মশানে পরিণত করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। লোদী সুলতানদের


আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য
তৈমুর লঙ্‌ এর রাজ্য
পরবর্তী কালে সাম্রাজ্য হইতে
বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাজ্য
কাশ্মীর
দিল্লী
জৌনপুর
বিহার
বঙ্গ
গুজরাট
মালোয়া
খান্দেশ
গণ্ডোয়ানা
উড়িষ্যা
বাহমনি রাজ্য
আরব
সাগর
বঙ্গোপ সাগর
বিজয় নগর
পাণ্ড্যরাজ্য
সিংহল

আমলে তৈমুরের বংশধর বাবর আসিয়া মুমূর্ষু দিল্লী সুলতানীর অবসান ঘটাইলেন।

সংস্কৃতির সমন্বয় : সুলতানী আমলের প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমানে ছিল বিজিত ও বিজেতার সম্পর্ক। বহুদিন ধরিয়া একসঙ্গে বাস করিতে করিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিল।

এই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় সেকালের লোকধর্ম। হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের মধ্যে একদল সাধুসন্তের আগমন হইল। তাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন অশিক্ষিত ও নীচবংশীয়। কিন্তু তাঁহারাই ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক। তাঁহারা বুঝিতেন ঈশ্বর এক, তিনি মন্দিরে বা মসজিদে থাকেন না, থাকেন মানুষের মধ্যে। সুতরাং পূজা-অর্চনা দ্বারা ইশ্বরকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় মানুষকে ভালবাসিয়া। আর সকল মানুষই সমান,—মানুষের ভিতরে জাতিভেদ নাই।

দক্ষিণ ভারতের রামানন্দ প্রথমে পথ দেখাইলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি মুসলমান অথবা নীচ জাতের সঙ্গে কোন পার্থক্য রাখিতেন না। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর, একজন মুসলমান জোলা। আর একজন বিখ্যাত শিষ্য রবিদাস ছিলেন মুচি। রাজবধূ মীরাবাঈ রবিদাসের কাছে দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন।

কবীর সাধু হইবার পরেও তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবনধারণ করিতেন। তাঁহার রচিত হিন্দী দোঁহাগুলিতে ধ্বনিত হইয়াছে মানুষের মিলনের সুর। একটি দোঁহায় তিনি বলিতেছেন, "হিন্দু মরে রামনাম ক'রে, মুসলমান মরে খোদা খোদা ক'রে,—এই সব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে পড়ল না সেই বাঁচল।" ঈশ্বরের কাছে জাত

ও ধর্মের বিচার নাই। ঈশ্বর আছেন ভক্তের প্রেমে, পণ্ডিতদের শাস্ত্রে নয়। কারণ, পণ্ডিতরা পড়ে পড়ে হয়েছেন পাথর, লিখে লিখে হয়েছেন ইট। প্রেমের একটি ছিটাও তাঁদের মনে প্রবেশ করিতে পারে না।" দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি নীচ জাতের সন্তরা ছিলেন কবীরপন্থী।

এমনি আর একজন সন্ন্যাসী ছিলেন নানক। লাহোরে ক্ষত্রীবংশে তাঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে তিনি সংসার ছাড়িয়া বাহির হন। তিনি সত্যের সন্ধানে মক্কা ও বোগদাদ পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন। তিনিও হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লামের সমন্বয় করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করিলেন। ইহারও সার কথা ঈশ্বর এক এবং মানুষ সমান। ঈশ্বরে ভক্তি, মানুষকে সেবা এবং নিজের ত্যাগ ও সাহস,—ইহা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। নানকের কথা অবলম্বন করিয়া পরে শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব রচিত হয় এবং তাঁর শিষ্যদিগকে লইয়া শিখসম্প্রদায় গঠিত হয়।



নানক

মহারাষ্ট্রে ছিলেন একনাথ নামে আর একজন সাধক। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি বিখ্যাত। মুসলমানদের মধ্যেও সুফী নামে সাধকগণ প্রেম ও সত্যের মহিমা প্রচার করিতেন। বাংলাদেশে প্রেমের গান গাহিলেন শ্রীচৈতন্য।

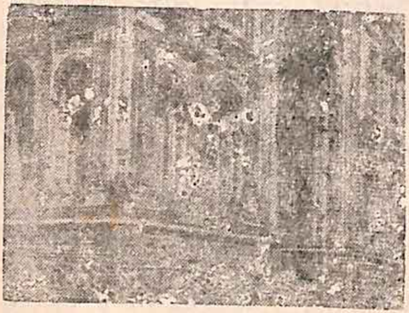
সাধুসন্তদের উদ্যোগে যেমন ধর্মের মিলন ঘটিল, যেমন ভাষা

ও সাহিত্যের উন্নতি হইল। উদারচিত্ত মুসলমান রাজারা প্রাদেশিক সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। সিকন্দর লোদী সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের জইনুল অবিদীন ও বাংলার হুশেন শাহও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও প্রাদেশিক সাহিত্যের সমর্থন করেন। মারাঠি, পাঞ্জাবী ও হিন্দী সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি হইল। ফারসী ও হিন্দী ভাষার সম্মিলনে উর্দু নামক মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইল। ফারসী ভাষায় রচিত হইল মধুর কাব্য ও সমসাময়িক ইতিহাস। কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আলাউদ্দীনের সভাকবি আমীর খসরু। হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাঁহার কাব্যে তুই ধর্মের মিলনের রেশ বাজিয়া উঠিয়াছে। স্থলতান নাসিরুদ্দীনের আমলে মিন্‌হাজউদ্দীন লিখিলেন মুসলিম জগতের ইতিহাস আর মোহম্মদ তুঘ্‌লুক ও ফিরোজ শাহ্‌র সমকালীন বিবরণী লিখিলেন জিয়াউদ্দীন বরনী।

এ যুগের সংস্কৃতির এবং হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের আর এক অঙ্গ হইল স্থাপত্য শিল্প: দিল্লীর স্থলতান, প্রাদেশিক নবাব এবং হিন্দুরাজা সকলেই প্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির, স্তম্ভ, সমাধি ও বাগিচা নির্মাণ করাইতেন। অবশ্য স্থলতানরা ছিলেন পথপ্রদর্শক। কুতবউদ্দীন ও ইলতুৎমিসের বিখ্যাত কীর্তি কুতবমিনার ও আজমীরের মসজিদ। আলাউদ্দীন দিল্লীর নিকটে সীরী নামে এক শহর স্থাপন করেন এবং কুতবমিনারের সামনে আলাই দরওয়াজা নামে এক তোরণ নির্মাণ করান। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক দিল্লীর কাছে তুঘ্‌লুকাবাদ নামে আর একটি শহর গড়িলেন আর ফিরোজ তুলিলেন ফিরোজাবাদ, জৌনপুর ও আরও অনেক শহর। পুরু ইটের দেওয়াল, গোল গম্বুজ, খিলান দেওয়া মস্ত দরজা, মিহি

নক্শা করা থাম ও দরজা-জানালা-দেওয়াল, মোলায়েম পালিশ আর চারিদিকে কেয়ারি করা বাগিচা—এই সব হইল এ যুগের স্থাপত্যের বিশেষত্ব।

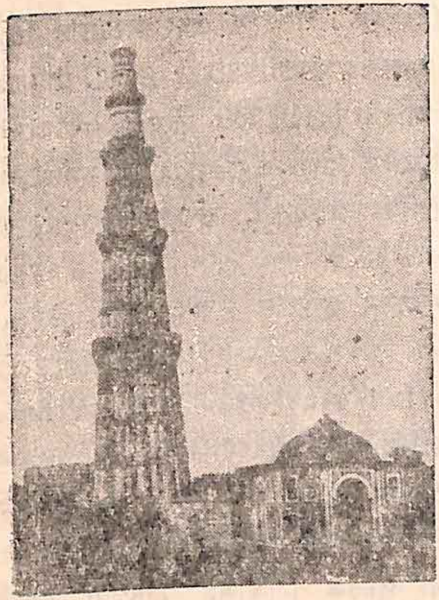
এই সমস্ত শিল্পনিদর্শনের মধ্যে কোন কোনটি মুসলিম ভাবাপন্ন —যেমন দিল্লী, মুলতান ও বিজাপুরের কাজ। কোন কোনটি বা হিন্দু-ভাবাপন্ন—যেমন রাজপুতনা, উড়িষ্যা ও বিজয়নগরের স্থাপত্য। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় প্রাদেশিক রাজা ও শাসকদের উৎসাহে যে নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিল তাহা হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার মিলিত এক নূতন ভারতীয় রীতি,—যেমন কাশ্মীর, জৌনপুর, মালব, গুজরাট ও বাংলার স্থাপত্য। শিল্পীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু, কাজেই রাজত্ব মুসলমানের হইলেও হিন্দু রীতিনীতি ও ঢং সমস্ত ইটপাথরের কাজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর কুতব মিনারেও হিন্দু কারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।



আলাই দরওয়াজা—কুতব মিনার, দিল্লী

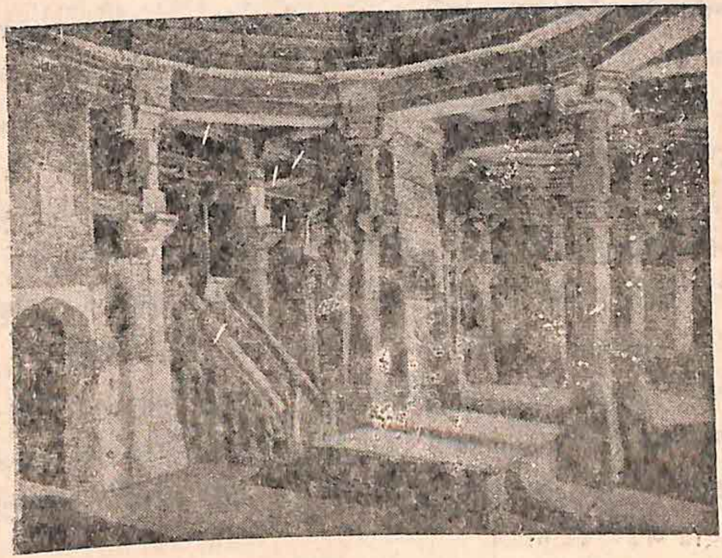


কোনারকের সূর্যমন্দির, উড়িষ্যা



কুতব মিনার,—দিল্লী

স্থাপত্যে হিন্দু মুসলিম সমন্বয়। গুজরাটে হিলাল খাঁর মসজিদের অভ্যন্তর—মধ্যের আসন ও স্তম্ভগুলি হিন্দুমন্দির হইতে লওয়া, উপরের চন্দ্রাতপটির স্থাপত্য রীতি মুসলিম।



সমাজের অবস্থা : যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস এবং সভ্যতার চিত্র আমরা যেমন পাই, ভারতীয় সমাজের অবস্থা আমরা ততটা জানিতে পারি না। তবে সমকালীন সাহিত্য বিবরণী এবং বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সাধারণ লোকের কথা ও কিছু কিছু সমাজচিত্র পাওয়া যায়। দেশে ধনসম্পদ ছিল অফুরন্ত। সুলতানরা বেপরোয়া খরচ করিতেন, আর লুণ্ঠনকারীরা আসিয়া প্রাণ ভরিয়া ধনরত্ন লইয়া যাইত। ধন ভোগ করিতেন সুলতান, নবাব, রাজা, উজীর, আমীর-ওমরাহরা। তাঁহারা বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকিতেন। চাষী ও সাধারণ লোকের ছিল চরম দৈন্যদশা। খাজনা দিতে তাহারা সর্বস্বান্ত হইত। দুর্ভিক্ষের সময়ে আর বাঁচিবার পথ থাকিত না। আমীর খসরু বলিয়াছিলেন—"রাজমুকুটের এক একটি মুক্তা যেন গরীব চাষীর সজল আঁখি হইতে ঝরিয়া পড়া এক একটি জমাটবাঁধা রক্তবিন্দু।" রুশ পর্যটক নিকিতিন বাহমনি রাজ্য পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "দেশের মানুষের চরম দুর্দশা আর ওমরাহরা ঐশ্বর্যে ও বিলাসে মগ্ন। তাঁহারা রূপার পালঙ্কে চাপিয়া ভ্রমণে বাহির হন, সামনে চলে সোনার জিন-লাগানো বিশটা ঘোড়া, পিছনে তিনশ' ঘোড়সওয়ার, পাঁচশ' পাইক, জনকয়েক শিঙা-বাদক, দশজন মশালধারী এবং দশজন গায়ক।" বিজয়নগর সম্বন্ধে পারসীক দূত আব্‌দুর রজ্জাক অবশ্য অন্যরূপ কথা বলিয়াছিলেন,—"রাজকোষের কুঠরিগুলিতে গর্ত করিয়া সোনার তাল দিয়া ভরিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে বড় ছোট নির্বিশেষে সকল দেশবাসী এমন কি বাজারের মজুররাও কানে, গলায়, বাহুতে, মণিবন্ধে ও আঙ্গুলে সোনা ও মণির গহনা পরে।" তখনকার দিনে প্রত্যেক সভ্য দেশেই ছিল বড়লোক ও গরীবের মধ্যে বিপুল ধনবৈষম্য। ভারতবর্ষেও ইহার অন্যথা হয় নাই।

সুলতান ও ওমরাহরা ছিলেন বহু দাসদাসীর মালিক। আলাউদ্দীনের ছিল পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস। ফিরোজের আমলে এই সংখ্যা বাড়িয়া তুই লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে নয়,—চীন, তুর্কীস্তান, পারস্য এবং আফ্রিকা হইতেও দাসদাসী আনা হইত। দাসরা ছোটবড় নানাপ্রকার কাজ করিত এবং তাহাদিগকে খাটাইয়া প্রভুরা অর্থ উপার্জন করিতে পারিত। সুতরাং তাহাদের অযত্ন হইত না। সুলতানরা কিছুকাল খাটাইয়া দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। মুক্ত দাসের মধ্যে কেহ কেহ যোগ্যতার বলে সামাজিক মর্যাদা ও সরকারী উচ্চপদ লাভ করিত।

মেয়েরা ছিল স্বামীর অথবা অন্য আত্মীয়ের অধীন। তাহারা বড় একটা ঘরের বাহির হইত না। বিদেশী দস্যু ও হানাদারদের উৎপাত ও পর্দাপ্রথা দৃঢ় হইল। অল্পবয়সে ছেলেমেয়ের বিবাহ হইত। কোন কোন পুরুষ বহু বিবাহ করিত। স্বামীর প্রতি আনুগত্য ছিল স্ত্রীর ধর্ম। কোথাও কোথাও হিন্দু সমাজে স্ত্রীকে মৃত স্বামীর চিতায় উঠিয়া সহমরণে যাইতে হইত। বড়ঘরের মেয়েদের বহু গুণ ও যথেষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। পর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ লিখিয়াছেন যে এখানে মেয়েরা কুস্তি করে, তলোয়ার খেলে, গানবাজনা জানে ও খরচপত্রের হিসাব রাখে। মেয়েদের মধ্যে অনেকে আছে লেখক, বিচারক ও প্রহরী।

পূর্ব কথা : গুপ্তরাজারা বাংলাদেশ জয় করিবার আগে এখানে একাধিক স্বাধীন রাজ্য ছিল,—যেমন গৌড়, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, সমতট ইত্যাদি। এই সমস্ত জনপদ ছিল মৌর্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গুপ্ত আমলে উত্তরবঙ্গ বা গৌড় ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নামক 'ভুক্তি' বা বিভাগের মধ্যে। গুপ্তসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর বাংলার কোন কোন অংশে কয়েকজন স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন গোপচন্দ্র।

সারা বাংলার প্রথম স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্ক। মুর্শিদাবাদ জেলার রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটিকে রাজধানী করিয়া তিনি কর্ণসুবর্ণ নামে এক রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মেদিনীপুর, গৌড়, উৎকল ও মগধ জয় করিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হন। অতঃপর মালবের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া তিনি কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইহার পরের কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। শশাঙ্ক হর্ষের হাতে পরাজিত হইলেও তাঁহার সাম্রাজ্য ক্ষুণ্ন হয় নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও আসামের রাজা ভাস্করবর্মা মিলিয়া গৌড় রাজ্য দখল করেন। হিউএন সাং এবং কোন কোন বৌদ্ধ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং আরও নানা প্রকারে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেন। এ কথা সত্য নাও হইতে পারে। কারণ হিউএন সাং নিজেই বাংলার অনেক বিহার মঠ দেখিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে লোকসঙ্গীতে গোপীচন্দ্র নামে একজন রাজার কাহিনী পাওয়া যায়। ইনি ষষ্ঠ শতকের গোপীচন্দ্র নহেন, দশম বা একাদশ শতকের কোন অখ্যাত রাজা। গোপীচন্দ্রের মা ময়নামতী যোগসিদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিলেন যে ছেলে সন্ন্যাসী না হইলে তাঁহার অকালমৃত্যু হইবে। গোপীচন্দ্র তখন যুবক। তাঁহার দুই রাণী অদুনা ও পদুনার বহু মিনতি উপেক্ষা করিয়া মা'র আদেশে গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইলেন এবং সিদ্ধাচার্য হাড়িপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

পাল ও সেনবংশ: শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে একশ' বছর ধরিয়া বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিল। শেষে দেশের প্রধানরা মিলিয়া গোপাল নামে একজন সেনাপতিকে রাজপদে বরণ করিলেন। গোপালের প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম পালবংশ। ইহাই বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজবংশ। বহুদিন পরে আবার বাংলায় দৃঢ়ভাবে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কনৌজ জয় করিয়া নিজের আশ্রিত এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেন। ইহার পর তাঁহার দিগ্বিজয়ী বাহিনীর নিকট একে একে প্রায় উত্তর ভারতের সমস্ত রাজা পরাজয় স্বীকার করিল। পরাজিত রাজারা ধর্মপালকে কর দিয়া এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য বজায় রাখিলেন। একমাত্র বাংলা ও বিহার পাল রাজার নিজ শাসনে রহিল। ধর্মপাল আর্যাবর্তে গুর্জর-প্রতিহার রাজার সহিত এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজার সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ইহাদের সহিত যুদ্ধে ধর্মপাল সফল হইতে পারেন

নাই। তাঁহার পর হইতে এই দুই দেশের সঙ্গে পালরাজাদের যুদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইল।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল আসাম ও উড়িষ্যা জয় করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ইহা ছাড়া তিনি হূণ, গুর্জর, কম্বোজ এবং রাষ্ট্রকূটদের দর্পও চূর্ণ করেন। পিতার প্রবর্তিত রাজনীতি অনুসরণ করিয়া দেবপাল ইহাদিগের উপর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, ইহাদের স্বাধীনতা নষ্ট করিলেন না। সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার সমসাময়িক রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিবার অনুমতি চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত পাঠান। দেবপাল এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া মঠের খরচ চালাইবার জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

দেবপালের পর হইতে পালবংশের পতন আরম্ভ হইল। উত্তর ও পশ্চিম বাংলা কাম্বোজবংশীয় রাজাদের হাতে চলিয়া গেল। এই রাজারা কোথা হইতে আসিলেন কেহ বলিতে পারে না। পঞ্জাবের পশ্চিমে ছিল কম্বোজ নামক জনপদ এবং বর্তমান ক্যাম্বোডিয়া ছিল কম্বোজ নামক ভারতীয় উপনিবেশ। কাম্বোজরা ইহার মধ্যে কোন এক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না।

কাম্বোজদের হাত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বাংলার ঐক্য ফিরাইয়া আনিলেন মহীপাল। তাঁহার সময়ে সুদূর দক্ষিণের চোল রাজা রাজেন্দ্রের আক্রমণে বাংলা বিধ্বস্ত হয়। মহীপালের পরে পালরাজ্য আবার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একাদশ শতকে দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে দিব্বোক নামক এক কৈবর্তের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে প্রজাবিদ্রোহ হয়। মহীপাল নিহত হইলেন এবং দিব্বোক বরেন্দ্রীর রাজা হইলেন। দিব্বোকের পুত্র ভীমের

রাজত্বকালে বরেন্দ্রী রীতিমত শক্তিশালী ও বর্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল।

মহীপালের ভাই রামপাল কৈবর্তরাজার হাত হইতে বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন। তিনি পালবংশের শেষ দীপশিখা। তাঁহার পর পালবংশের গৌরব অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

অবশেষে দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে দুর্বল পালরাজাকে সরাইয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করিল সেনবংশ। সেনরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা আসিলেন সুদূর দক্ষিণের কর্ণাটক হইতে। বাংলায় এই শেষ হিন্দু রাজবংশ। এই বংশের রাজা বল্লালসেন উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। এতদিন ছিল বর্ণভেদ। এবার বর্ণের মধ্যে দেখা গেল কুলভেদ—কুলীন ও অকুলীনের পার্থক্য।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন। তাঁহার সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছিল। উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে মগধ লইয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী, ইহা গৌড়ের নূতন নাম। তুর্ক লেখক মীনহাজউদ্দীন লক্ষ্মণসেনকে হিন্দুরাজগণের খলিফাতুল্য বলিয়া বর্ণনা করেন। আশী বছর বয়সে যখন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন তখন ১২০২ সালে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী আসিয়া এই নগর অধিকার ও লুঠ করেন। অবশিষ্ট বাংলায় সেনবংশের রাজত্ব চলিতে থাকে। পরে তুর্করা আসিয়া সমস্ত বাংলাদেশ জয় করিয়া লয়।

সংস্কৃতি: পাল আমলে বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হইত। অনেক বাঙালী কবি, বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রজ্ঞ সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। বাঙালী বৈদ্যদের হাতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের

বিশেষ উন্নতি হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য। ইহার পাঠে আগাগোড়া দুইটি অর্থ আছে। এক অর্থ ইহা শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অন্য অর্থে রাজা রামপালের জীবনী।

এ সময়ে আর একটি বিশেষত্ব মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পাশে তান্ত্রিক সহজযানের আবির্ভাব। সহজিয়া সাধুরা বৌদ্ধধর্মকে সহজ করিয়া অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রচার করিলেন। ইহা হইতে বাংলা ভাষার জন্ম। তাঁহারা নিজেরা ছিলেন নীচ জাতের, তাঁহাদের ধর্মও প্রচলিত ছিল নীচ জাতের মধ্যে। যোগী সাধুরা বৌদ্ধ গান বাঁধিতেন, এই গানগুলিকে বলে চর্যাপদ। ইহা বাংলাভাষার প্রথম সাহিত্য। এই যোগী সাধুদের লইয়া অনেক লোকসঙ্গীত রচিত হইয়াছে, যেমন ময়নামতীর গান।

সেন রাজারা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে বেশী অনুগ্রহ করিতেন। বল্লাল সেন হিন্দুদের ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাঁচখানি বই লেখেন। তার মধ্যে দুখানি পাওয়া গিয়াছে, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। লক্ষ্ণসেনের ধর্মাধক্ষ্য হলায়ুধ ছিলেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার লেখা বহু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার নাম ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব। ইহাতে বেদের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা আছে। লক্ষ্মণসেন নিজে কবি ছিলেন আর তাঁহার সভায় ছিলেন পাঁচজন বিখ্যাত কবি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি জয়দেব। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়া সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ নামে একটি গীতিকাব্য লেখেন। ভাব ও সুরের মিষ্টতার জন্য ইহা ভারতে আদর পাইয়াছে। জয়দেব ছিলেন প্রেমিক ভক্ত এবং তিনি প্রেমের বলে কৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন।

পাল ও সেন আমলে বাংলাদেশে সকল ধর্মের সমাবেশ ছিল। পালরাজ্য ছিল ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়। ধর্মপাল অনেক

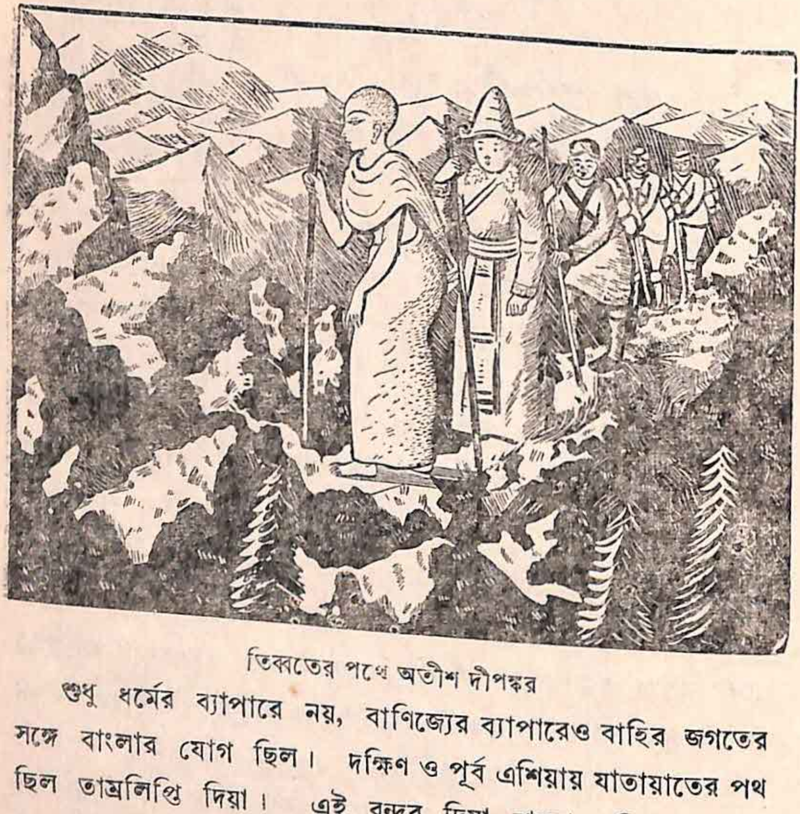
বিহার স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে বিহারের ওদন্তপুরির বিহার ও রাজসাহীতে সোমপুরের বিহার ছিল প্রসিদ্ধ। পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। সবচেয়ে নাম ছিল বিক্রমশীল বিহারের। গঙ্গাতীরে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান এখনও আবিষ্কার হয় নাই। নালন্দার পরেই ছিল ইহার খ্যাতি। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্ররা এখানে পড়িতে আসিত। বিক্রমশীল ছিল মহাযান ধর্মের পীঠস্থান।


সোমপুর বিহারের চিত্র

হর্ষবর্ধনের সময়ে নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন বাঙালী ভিক্ষু শীলভদ্র। চারশ' বছর পরে মহীপালের সময়ে বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য ছিলেন আর একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী ভিক্ষু,—অতীশ।

৯৮০ সালে গৌড়ের রাজবংশে অতীশের জন্ম হয়। ওদন্তপুরির বিহারে অন্যান্য পীঠস্থানে অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি পান। তারপর সুবর্ণদ্বীপে বিখ্যাত আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে গিয়া তিনি বার বছর শিক্ষালাভ করেন। সিংহলের পথে মগধে ফিরিয়া তিনি বিক্রমশীলের আচার্য-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিব্বতের রাজা ভারতবর্ষে আচার্যের সন্ধানে দূত পাঠান। দূত দামী উপহার লইয়া দীপঙ্করের নিকট আসিল। দীপঙ্কর উপহার সমেত দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। এমন সময়ে তিব্বতী রাজা শত্রুর হাতে বন্দী হইলেন। কারাগারে মৃত্যু ঘটিবার আগে তিনি আবার মিনতি করিয়া দীপঙ্করকে পত্র লিখিলেন। এই অন্তিম অনুরোধ দীপঙ্কর ঠেলিতে পারিলেন না।

নেপালে ও হিমালয়ের দুর্গম পথে মাত্র চারজন সঙ্গী লইয়া তিনি তিব্বতে যাত্রা করিলেন। পথে দুইবার তাঁহারা শত্রুর হাতে পড়িলেন, সঙ্গে তিব্বতী পণ্ডিত মারা গেলেন। তিব্বতে পৌঁছিয়া তিনি তের বছর সেখানে বাস করিলেন, অনেক ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া মঠের সংস্কার করিয়া ১০৫৩ সালে সেখানে দেহরক্ষা করিলেন। এখনও তিব্বতীরা তাঁহার স্মৃতির পূজা করে।



তিব্বতের পথে অতীশ দীপঙ্কর

শুধু ধর্মের ব্যাপারে নয়, বাণিজ্যের ব্যাপারেও বাহির জগতের সঙ্গে বাংলার যোগ ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের পথ ছিল তাম্রলিপ্তি দিয়া। এই বন্দর দিয়া বাংলার বিখ্যাত মিহি সুতার কাপড় দেশবিদেশে চালান যাইত। হিউএন সাং তাম্রলিপ্তির বর্ণনায় বলিয়াছেন যে এখানে বাণিজ্যের জন্য দেশের ভিতর হইতে

বহু মূল্যবান পণ্য সংগৃহীত হইয়া আসিত। আবার চাষও হইত, প্রচুর ফলফুল হইত। একারণে এখানকার লোক ছিল অবস্থাপন্ন। বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দির নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থান করিত।

সমাজ ঃ জাতিভেদ ও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বাংলাদেশে অন্য জায়গার চেয়ে একটুও কম ছিল না। একশ' রকম শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। তাহা হইলেও জীবন নিরানন্দ ছিল না। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে ঘরে ঘরে ক্রিয়াকর্ম ও উৎসব লাগিয়া থাকিত। তার উপর ছিল বার মাসে তের পার্বণ,—পূজা ব্রত। ক্রিয়াকর্ম ও পূজাপার্বণের সময়ে নাচ-গান-বাজনা, সাজসজ্জা, খাওয়া-দাওয়া ও নানারূপ আমোদ-আহ্লাদ হইত। সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল দুর্গাপূজা ও হোলি। তারপর লক্ষ্মীপূর্ণিমা ভাইফোঁটা ইত্যাদি। খেলাধূলার মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল শিকার, পশুপাখির লড়াই, কুস্তি, পাশা ও দাবা, কড়ি ও ঘুঁটির খেলা। সাধারণ লোকের যানবাহন ছিল নৌকা ও গরুর গাড়ি। বড়লোকেরা হাতী ঘোড়ায় চাপিত, ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইত।

পুরুষরা বহুবার বিবাহ করিতে পারিত। মেয়েরা ছিল পুরুষের অধীন। তবে তাহাদিগকে ঘরে আটক থাকিতে কিংবা লম্বা ঘোমটা দিয়া চলাফেরা করিতে হইত না। তাহারা লেখাপড়া শিখিত। বিধবাদের এখনকার চেয়েও কঠোর ভাবে জীবন কাটাইতে হইত। কখনো কখনো তাহারা মৃত স্বামীর চিতায় উঠিয়া সহমরণে যাইত।

প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছমাংস, ফলমূল, শাকসব্জি, দুধ ও দুধের জিনিস। ইলিশ মাছের আদর ছিল সবচেয়ে বেশী। মদ খাওয়ার অভ্যাস যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা শাড়ি পরিত। কখনো কখনো মেয়েরা কাঁচুলি বা বডিস্ ও ওড়না গায়ে দিত, পুরুষরা চাদর। মেয়ে-পুরুষ সবাই সাধ্যমত আংটি, হার, কুণ্ডল ও অন্যান্য গহনা পরিত। এয়োস্ত্রীরা কপালে সিঁদুর দিত, টিপ পরিত, পায়ে আলতা লাগাইত। মাথায় কেহ কোন টুপি বা আবরণ রাখিত না। মাথার ভূষণ ছিল চুল, পরিপাটি করিয়া আঁচড়ানো, কুঁচানো। পুরুষরা রাখিত বাব্‌রি, মেয়েরা বাঁধিত নানান ফ্যাসানের খোঁপা।

সুলতানী আমল ঃ বখ্‌তিয়ার খলজী নবদ্বীপ অধিকার করিবার পর তাঁহার পুত্র বখ্‌তিয়ারউদ্দিন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ ঘোরসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে এক সময়ে সমস্ত বাংলা দেশ সুলতানীর করায়ত্ত হয়। কিন্তু বাংলা হইতে দিল্লী বহু দূর। এখানে প্রভুত্ব বজায় রাখা সুলতানদের পক্ষে সহজ ছিল না। এখানকার শাসনকর্তারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিতেন। বল্‌বনের পর হইতে তাঁহারা দিল্লী শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সুলতান হইয়া বসিলেন। ফিরোজ শাহের সময়ে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দুই শাসনবিভাগ একত্র করিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন ফিরোজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ দুর্ভেদ্য একদালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বহুদিন দুর্গ অবরোধের পর ফিরোজকে বিফল হইয়া ফিরিতে হইল। পরে ফিরোজ আবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দর একই কৌশলে ফিরোজকে প্রতিহত করেন। তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দীনও ছিলেন বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ হয়।

ইহার পর বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ। তাঁহার পুত্র যদু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া

পিতার পরে রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার ইলিয়াস্ শাহী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ রাজত্ব বেশী দিন টিকিল না। হাব্সী ক্রীতদাসরা প্রবল হইয়া বাংলার সুলতানী দখল করিয়া বসিল। ইহাদের অত্যাচারে বাংলার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শেষে ওমরাহ ও সৈন্যদের সহায়তায় প্রধান মন্ত্রী হুসেন হাব্সী সুলতানকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। হুসেন শাহের ছাব্বিশ বছরের রাজত্বকাল মধ্যযুগের বাংলার গৌরবময় অধ্যায়। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম ও সুশাসনের জন্য তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বহু জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহাকে বলিত শ্রীকৃষ্ণের অবতার। হুসেন শাহের মৃত্যুর প্রায় একশ' বছর পরে আকবর বঙ্গদেশ জয় করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

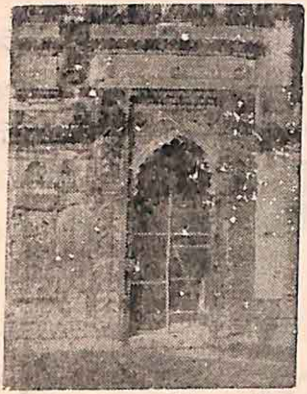
সুলতানী আমলের সংস্কৃতি ঃ বখ্তিয়ার খল্জীর নদীয়া জয়ের পর হইতে একশ' বছর পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ছিল না। তারপর ক্রমে আপস হইল, উভয়ে প্রতিবেশীর মত বাস করিতে লাগিলেন। সতের শতকে কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন চণ্ডীতে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এক নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের চালচলন নকল করিত—মুসলমানদের পোশাক পরিত, দাড়ি রাখিত ও ফারসীভাষা শিখিত। মুসলমানরাও অনেকে হিন্দু আচার ও প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। হুসেন শাহের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান এক মণ্ডপে বসিয়া সত্যপীরের পূজা করিত। হিন্দুরাও মুসলিম ফকির-দরবেশদিগকে ভক্তি করিত।

সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ হইল। বাংলা সাহিত্যের চর্চায় সুলতানরা ছিলেন অনুরাগী। হুসেন শাহের আগ্রহে ভাগবত পদ্মপুরাণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশের বাংলায় অনুবাদ হয়। তাঁহার পুত্র নশরৎ শাহ্ মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করান। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি কৃতজ্ঞতার সহিত হুসেন শাহের নাম করিয়া গিয়াছেন।

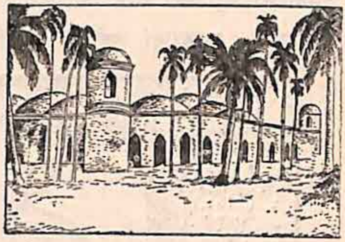
ন্যায় দর্শনের চর্চার জন্য বাংলার ছিল ভারতজোড়া খ্যাতি। রঘুনন্দন ছিলেন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক-শিরোমণি। নবদ্বীপের টোল ছিল ন্যায়শাস্ত্রের পীঠস্থান। টোল হইল মধ্যযুগের বিদ্যালয়। ইয়োরোপের স্কুলগুলির মত এখানেও এক এক পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ছাত্রসমাবেশ হইত।

সুলতানী আমলের সমাধি ও মসজিদগুলি বাংলার স্থাপত্য শিল্পের গৌরব। সিকন্দর শাহ্ পাণ্ডুয়ায় চারশ' গম্বুজের আদিনা মসজিদ নির্মাণ করান। গৌড়ে হুসেন শাহের আমলে ছোট সোনা ও নশরৎ শাহের সময়ে বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদও সমকালীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। বাংলার নির্মাণশিল্পে হিন্দু ও মুসলিম রীতির সমন্বয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। স্তম্ভ ও তোরণের মুসলিম ধারার সঙ্গে মিশিয়াছে হিন্দু মন্দিরের গোল কার্নিস ও কারুকার্যে পদ্মফুলের চিত্র।

হিন্দুর ধর্মাচরণে সুলতানরা বাধা দিতেন না। হুসেন শাহ্ চৈতন্যদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন যে গৌড়ে তাঁহার প্রচারকার্যে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। হুসেন শাহ্ ও তাঁহার পরবর্তী উদারচেতা সুলতানদের



ছোট সোনা মসজিদ—গৌড়



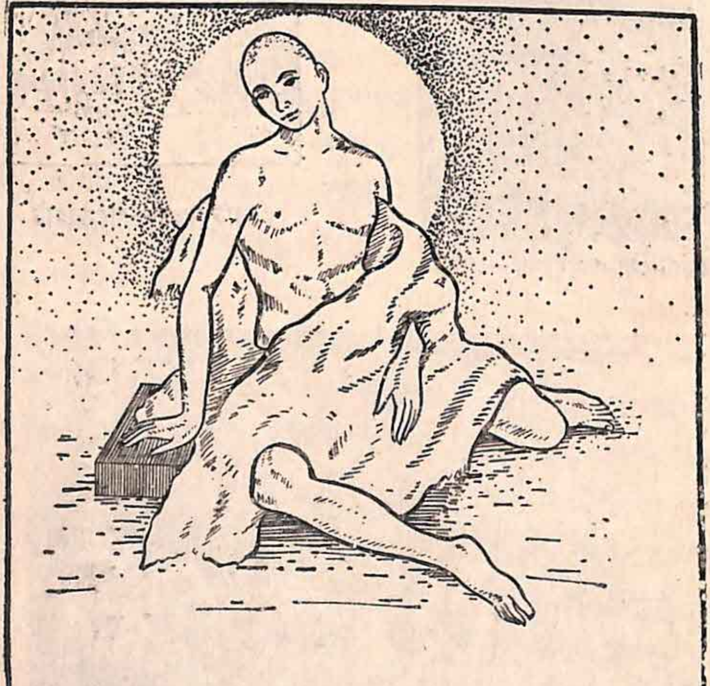
ষাট গম্বুজ—বাগেরহাট



বড় সোনা মসজিদ—গৌড়

সমর্থন পাইয়াই বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

চৈতন্য ছিলেন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি কৃষ্ণনাম গাহিয়া এবং ভক্তি ও প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। শিষ্যদিগকে তিনি



তৃণের মত নম্র ও নিরহঙ্কার হইতে বলিতেন। অহঙ্কার দূর করিয়া ভগবানকে বিশ্বাস ও ভক্তি আনিতে পারিলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায় ও পৃথিবীর দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি পায়। অনেক অস্পৃশ্য হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান তাঁহার দলে আসিয়া জুটিল।

ইহাদের মধ্যে যবন হরিদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান ও নীচ জাতকে কোল দেওয়ার জন্য নবদ্বীপের গোঁড়া নৈয়ায়িকের দল চৈতন্যের পিছনে লাগিল। দুষ্ট লোকের হাতে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াও তিনি দমিলেন না। তাঁহার দুষ্ট লোককে ভালবাসা দিয়া জয় করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। শোনা যায় জগাই মাধাই নামে দুই দুর্বৃত্ত তাঁহাকে মারধোর করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। চৈতন্য সারা ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। বাংলা ও উড়িষ্যা ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গেল। বুদ্ধদেবের মত চৈতন্যদেবকেও বিশ্বাসী হিন্দুরা ভগবানের অবতার বলিয়া গণ্য করে।

তের শতকের প্রথম পাদে ভারতে দাস সুলতানেরা রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকে মিশর পর্যন্ত ছড়াইয়াছিল গুটি কয়েক তুর্করাজ্য। এমন সময়ে তুর্ক ও উত্তর-এশিয়ার প্রান্তর হইতে আসিল আবার এক তাতার জাতি। সভ্য জগতের অধিকাংশ দলিত মথিত করিয়া তাহারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করিল। ইহার পূর্ববর্তী সলজুক তুর্কদের জ্ঞাতি। ইহারা প্রান্তরে প্রান্তরে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সঙ্গের গরুর গাড়িতে থাকিত তাঁবু ও জিনিসপত্র। অন্ধকার নামিলে তাহারা কোথাও তাঁবু খাটাইয়া রাত্রিবাস করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস আর ঘোড়ার দুধ। সঙ্গে সঙ্গে চলিত মদ। পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধ ছিল মোঙ্গলদের জীবিকা। এই সকল বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ প্রধান। ঘোড়া ও তীর ধনুক ছিল তাহাদের চিরসাথী। মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিত। বাল্যকাল হইতে ছেলেরা হইয়া উঠিত পাকা ঘোড়সওয়ার ও তীরন্দাজ।

চিঙ্গীজ খাঁ ঃ চিঙ্গীজ খাঁ (১২০৬) এই যাযাবর জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীতে পরিণত করিলেন। প্রথমে তিনি চীনের উত্তর-পূর্ব অংশ অধিকার করিলেন। তারপর তুর্কীস্তান ও পারস্যের অধীশ্বর খ্বারিজ্‌ম্ শাহ্‌র বশ্যতা দাবী করিয়া দূত পাঠাইলেন। মূর্খ খ্বারিজ্‌ম্ দূতদিগকে বধ করিলেন। চিঙ্গীজ প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে চলিয়া আসিলেন এশিয়ার অপর প্রান্তে। তাঁহার দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ারের

দল পামীর পর্বত পার হইয়া তুর্কীস্তানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এক এক করিয়া অক্ষু উপত্যকার নগরগুলির উপর দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। বাহ্লিক ও সমরখন্দের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক নিহত হইল ও অর্ধেক হইল বিজেতাদের দাস। বোখারার বিখ্যাত মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে মোঙ্গল ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হইল।



চিঙ্গীজ খাঁ

খ্বারিজম্ শাহীর অবসানের পর মোঙ্গলবাহিনী উত্তরদিকে ছুটিল। কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর পার হইয়া চিঙ্গীজ কিয়েভ্-এর রুশ রাজন্যকে পরাস্ত করিলেন। নীপার ও ভলগা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রসারিত হইল। ইতোমধ্যে পরাজিত খ্বারিজ্ম্ শাহ্ আসিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে চিঙ্গীজ সিন্ধুতীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস খ্বারিজ্ম্‌কে আশ্রয় দিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে প্রস্তুত হইলেন না। খ্বারিজ্ম্ পঞ্জাব ছাড়িয়া পলাইলেন, চিঙ্গীজও ভারতবর্ষকে নিষ্কৃতি দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখন হইতেই ভারতে মোঙ্গল-বিভীষিকার সূত্রপাত হইল।

১২২৭ সালে চিঙ্গীজ মঙ্গোলিয়ার এক বিদ্রোহ দমন করিতে গেলেন। পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য তখন প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পারস্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তের শতকের প্রথম পাদে ভারতে দাস স্থলতানেরা রাজত্ব করিতে-ছিলেন। পশ্চিমদিকে মিশর পর্যন্ত ছড়াইয়াছিল গুটি কয়েক তুর্করাজ্য। এমন সময়ে তুর্ক ও উত্তর-এশিয়ার প্রান্তর হইতে আসিল আবার এক তাতার জাতি। সভ্য জগতের অধিকাংশ দলিত মথিত করিয়া তাহারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করিল। ইহার পূর্ববর্তী সলজুক তুর্কদের জ্ঞাতি। ইহারা প্রান্তরে প্রান্তরে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সঙ্গের গরুর গাড়িতে থাকিত তাঁবু ও জিনিসপত্র। অন্ধকার নামিলে তাহারা কোথাও তাঁবু খাটাইয়া রাত্রিবাস করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস আর ঘোড়ার দুধ। সঙ্গে সঙ্গে চলিত মদ। পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধ ছিল মোঙ্গলদের জীবিকা। এই সকল বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ প্রধান। ঘোড়া ও তীর ধনুক ছিল তাহাদের চিরসাথী। মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিত। বাল্যকাল হইতে ছেলেরা হইয়া উঠিত পাকা ঘোড়সওয়ার ও তীরন্দাজ।

চিঙ্গীজ খাঁ ঃ চিঙ্গীজ খাঁ (১২০৬) এই যাযাবর জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীতে পরিণত করিলেন। প্রথমে তিনি চীনের উত্তর-পূর্ব অংশ অধিকার করিলেন। তারপর তুর্কীস্তান ও পারস্যের অধীশ্বর খ্বারিজ্‌ম্ শাহ্‌র বশ্যতা দাবী করিয়া দূত পাঠাইলেন। মূর্খ খ্বারিজ্‌ম্ দূতদিগকে বধ করিলেন। চিঙ্গীজ প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে চলিয়া আসিলেন এশিয়ার অপর প্রান্তে। তাঁহার দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ারের

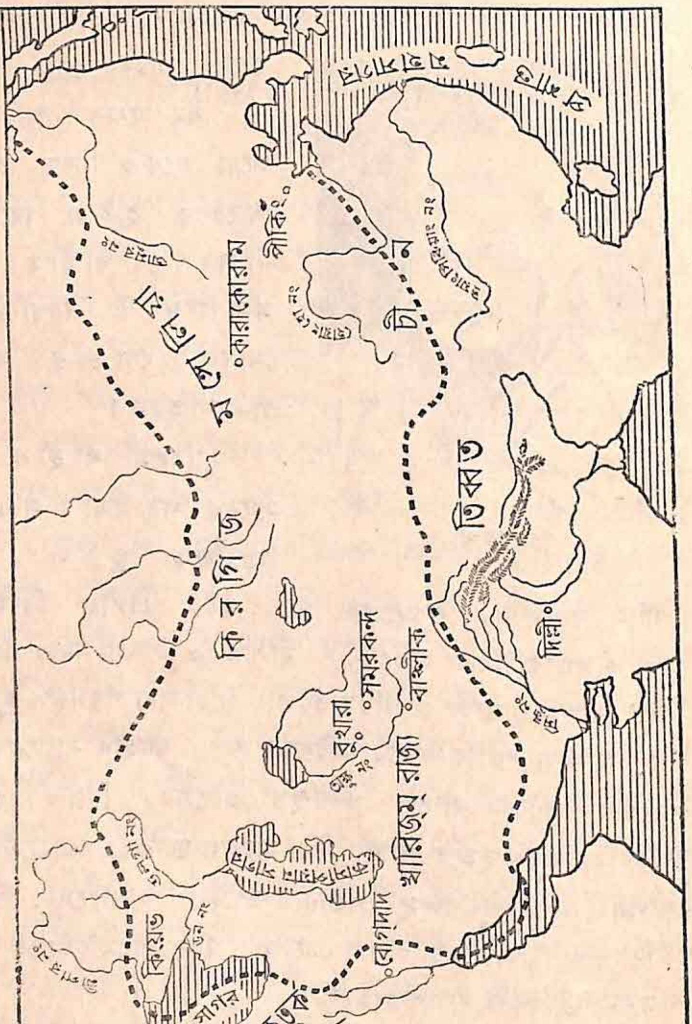
দল পামীর পর্বত পার হইয়া তুর্কীস্তানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এক এক করিয়া অক্ষু উপত্যকার নগরগুলির উপর দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। বাহ্লিক ও সমরখন্দের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক নিহত হইল ও অর্ধেক হইল বিজেতাদের দাস। বোখারার বিখ্যাত মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে মোঙ্গল ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হইল।



চিঙ্গীজ খাঁ

খ্বারিজম্ শাহীর অবসানের পর মোঙ্গলবাহিনী উত্তরদিকে ছুটিল। কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর পার হইয়া চিঙ্গীজ কিয়েভ্-এর রুশ রাজন্যকে পরাস্ত করিলেন। নীপার ও ভলগা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রসারিত হইল। ইতোমধ্যে পরাজিত খ্বারিজম্ শাহ্ আসিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে চিঙ্গীজ সিন্ধুতীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস খ্বারিজম্‌কে আশ্রয় দিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে প্রস্তুত হইলেন না। খ্বারিজম্ পঞ্জাব ছাড়িয়া পলাইলেন, চিঙ্গীজও ভারতবর্ষকে নিষ্কৃতি দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখন হইতেই ভারতে মোঙ্গল-বিভীষিকার সূত্রপাত হইল।

১২২৭ সালে চিঙ্গীজ মঙ্গোলিয়ার এক বিদ্রোহ দমন করিতে গেলেন। পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য তখন প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পারস্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।



মোঙ্গল সাম্রাজ্য : চিঙ্গীজ খাঁ : ১২২৭

ইহার পূর্বে এত বড় সাম্রাজ্য আর হয় নাই। আর সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন পৈশাচিক বর্বরতাও বোধ হয় পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোথাও বাধা পাইলে চিঙ্গীজ সেই স্থান অগ্নি ও তরবারি দ্বারা ছারখার করিয়া দিতেন। নগরের পর নগর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বর্ধিষ্ণু লোকালয় মরুভূমি করিয়া মোঙ্গল-বাহিনী জয়যাত্রায় বাহির হইত। কথিত আছে হাতের তালুতে রক্তের চিহ্ন লইয়া চিঙ্গীজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ও তাঁহার বর্বরতার শেষ হয় নাই। পরলোকে তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য চল্লিশটি কুমারীকে তাঁহার সমাধিমূলে বলি দেওয়া হইয়াছিল।

এত নিষ্ঠুরতার ভিতরেও ছিল কাব্যরস। চিঙ্গীজ নাকি কবিতা লিখিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও কোন ধর্মের তিনি অবমাননা করেন নাই। শাসনকার্যে তাঁহার ডান হাত ছিলেন সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত চীন রাষ্ট্রবিদ্ চুৎসাই। চিঙ্গীজের মৃত্যুর পরেও তিনি বহুকাল ধরিয়া মোঙ্গলসাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রভুদের বর্বরতা হইতে অনেক নগর শিল্পসম্পদ রক্ষা পাইয়াছিল। রাজকার্যের অবসরে তিনি সঙ্গীত ও প্রাচীন বিদ্যার চর্চা করিতেন। একবার তাঁহার বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ আসিল। ঘুষের ধনরত্নের সন্ধানে তাঁহার ঘর তল্লাস করা হইল। পাওয়া গেল কিছু বাদ্যযন্ত্র এবং প্রাচীন পুঁথি ও লিপি।

মোঙ্গল সাম্রাজ্য : চিঙ্গীজের পরবর্তী খাঁ বা সর্দারদের আমলে মোঙ্গলরা রুশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল,—কিয়েভ্ ধ্বংস করিয়া সমস্ত রুশ অধিকার করিল। তারপর পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারী শ্মশান করিয়া ফিরিল দক্ষিণদিকে। সমস্ত চীন তাহাদের পদানত হইল।

তিব্বত, পারস্য ও সীরিয়া আক্রমণ করিয়া তাহারা বিধ্বস্ত করিল। চিঙ্গীজের পৌত্র হুলাগু সীরিয়া জয় করিবার আগে বোগ্‌দাদ আক্রমণ করিয়া চল্লিশ দিন ধরিয়া ইহার অপরিমিত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিলেন। তারপর তিনি খলিফা ও বহু নগরবাসীকে হত্যা করিলেন এবং বাকি সকলকে ক্রীতদাস করিয়া লইয়া গেলেন। মুসলিম জগতের ধর্মগুরু রহিল না। আর তার মধ্যমণি বোগ্‌দাদ শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিল (১২৫৮)।

তবুও মোঙ্গলদিগকে একেবারে বর্বর বলা চলে না। ইহারা কিছু বিচক্ষণ সমরকুশলী। রণবিজ্ঞানে ইয়োরোপীয়রা ছিল ইহাদের কাছে শিশু। আক্রমণের আগে ইহারা সুচতুর গোয়েন্দা পাঠাইয়া বিপক্ষের খবর আনিত,—বিপক্ষের বল ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে যুদ্ধের কৌশল স্থির করিত।

১২৫৯ সালে হুলাগুর ভাই কুব্‌লাই এই বিশাল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। তিনি কারাকোরাম হইতে রাজধানী সরাইয়া লইলেন পিকিং শহরে। তাঁহার পর (১২৯৪) হইতে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট খণ্ড সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইল।


কুব্‌লাই খাঁ

এশিয়ার ও পূর্ব ইয়োরোপের আকাশে মোঙ্গলদের উদয় ধূমকেতুর মত। কিন্তু তাহাদের সাম্রাজ্য পরোক্ষভাবে সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করিল। ইয়োরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যাতায়াতের পথ কিছুকালের মত মুক্ত

হইল। দেশবিদেশ হইতে কারাকোরামের দরবারে আসিত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, বণিক ও ধর্মপ্রচারক। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভাবের আদান প্রদান হইলে সভ্যতার উন্নতি হয়।

মার্কো পোলো ও কুবলাই খাঁঃ কুবলাই খাঁ ও তখনকার চীনের সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন মার্কো পোলো নামে একজন ভেনিসীয় পর্যটক। ১২৯৮ সালে ইটালীর জেনোয়া ও ভেনিস দুই নগরীর মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। মার্কো পোলো যুদ্ধে বন্দী হন। কারাগারে সময় কাটাইবার জন্য তিনি তাঁহার ভ্রমণের গল্প বলিতেন আর একজন কারাসঙ্গী সেগুলো লিখিয়া রাখিতেন। ইহাই পরে মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী রূপে প্রকাশিত হয়।


মার্কো পোলো

মার্কো পোলোর বাবা ও কাকা ছিলেন ভেনিসের সওদাগর। তাঁহারা গিয়াছিলেন বোখারায় ব্যবসার কাজে। সেখানে কুবলাই খাঁ ও একদল দূতের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়। দূতদের অনুরোধে তাঁহারা সাড়ে তিন বছর পথ চলিয়া কুব্‌লাই-এর দরবারে আসিলেন। কুব্‌লাই তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইয়োরোপের খবর আগ্রহ সহকারে শুনিলেন। তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন চীন দেশে একশ' জন খ্রীষ্টান মিশনারী পণ্ডিত লইয়া আসিবার জন্য। পোলো-ভ্রাতৃদ্বয় ইয়োরোপে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাত্র দুইজন মিশনারী লইয়া আবার

চীনের দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল বালক মার্কো পোলো। মিশনারীরা পথের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলেন। পোলোরা পারস্য ও তুর্কীস্তান হইয়া পিকিং-এ আসিলেন। এবারও রাজদরবারে তাঁহাদের আদর যত্নের ত্রুটি হইল না। বুদ্ধিমান তরুণ মার্কো কুব্‌লাই-এর সুনজরে পড়িলেন। সম্রাট তাঁহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়া কতকগুলি কাজের ভার দিলেন এবং শেষে এক নগরের শাসনভার অর্পণ করিলেন।

ষোল বছর বিদেশে কাটাইবার পর পোলোদের মন দেশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। সম্রাট প্রথমে তাঁহাদিগকে ছাড়িতে রাজি হন নাই। শেষে তিনি এক মোঙ্গল রাজকুমারীর সহযাত্রী করিয়া তাঁহাদিগকে পারস্যে পাঠাইলেন। এবার তাঁহারা চীনের পূর্বতীর হইতে জলপথে রওনা হইলেন। সুমাত্রা ও দাক্ষিণাত্য হইয়া তাঁহারা দুই বছর পরে পারস্যে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে আসিলেন কনস্টাণ্টিনোপল্‌-এ। তাঁহাদের তাতার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। মনে করিলেন ইহারা কোথাকার কোন্ ভবঘুরে। শেষে তাঁহারা এক ভোজসভায় সকলকে ডাকিয়া পুরু জামাগুলি খুলিলেন এবং জামা কাটিয়া ভিতর হইতে বাহির করিলেন হীরা, মণি, চুণী, পান্না। তখন আর না চিনিয়া যায় কোথায়? কিন্তু মার্কো পোলোর কথা সহজে লোকে বিশ্বাস করে নাই। তাঁহার গল্প লইয়া বহুদিন পর্যন্ত সকলে হাসাহাসি করিত।

কুব্‌লাই খাঁর দরবার এবং পিকিং শহর মার্কো পোলো নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। শহরের বাজারে দেশবিদেশের পণ্য আসিত। বিদেশীদের জন্য ছিল ভাল ভাল হোটেল। নাগরিকদের জন্য ছিল গরম জলের স্নানাগার। শহরের বাহিরে পথের ধারে

ধারে সরাইখানা। দেশ ভরিয়া আঙ্গুর গাছের ঝাড়, ক্ষেত ও বাগান, —স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠ, ও গণ্ডগ্রাম। মার্কো পোলোর শাসনাধীন হ্যাংচাউ শহরে ছিল বাঁধানো রাস্তা ও নর্দমা, বহু পুল, বাজার, বন্দর ও দোকান। ভারতীয় বণিকদের জন্য এখানে ছিল পাথরের তৈয়ারী গুদামঘর আর স্নানাগার। রেশম ও সোনার কাপড় এখানকার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ব্রহ্মদেশে তিনি দেখিয়াছিলেন বিরাট গজারোহী সেনা। মোঙ্গল তীরন্দাজদের কাছে ছত্রভঙ্গ হইয়া ইহারা বশ মানিয়াছিল। জাপানে ছিল সোনার ছড়াছড়ি। দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন এক শক্তিমতী রাণী। এখানে মার্কো পোলো নাকি ভারতীয় যোগীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

তৈমুর লঙ্ঃ কুব্লাই খাঁর একশ' বছর পরে সমরখন্দ হইতে আসিলেন তুর্ক জাতির চাগ্তাই শাখার এক যোদ্ধা। ইহার নাম তৈমুর। একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন বলিয়া ইনি তৈমুর লঙ্ নামে পরিচিত। মায়ের দিক দিয়া চিঙ্গীজ ছিলেন ইহার পূর্বপুরুষ। আর পরবর্তীকালে ভারতের মুঘল বাদশাহরা ছিলেন ইহার বংশধর। ইনি ছিলেন সিয়া মুসলমান। রুশের দক্ষিণ প্রান্ত এবং পারস্য জয় করিয়া তিনি পঞ্জাব অধিকার করিলেন, সেখান হইতে দিল্লী নগরী ধ্বংস করিয়া আসিয়া পড়িলেন সীরিয়া ও দামাস্কাসের উপর। তারপর এশিয়া মাইনরে তুর্ক সুলতানকে পরাস্ত করিয়া তিনি চীনের দিকে ছুটিলেন। পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পূর্ববর্তী মোঙ্গল বিজয়ীদের সঙ্গে তৈমুরের তফাত এই যে তাঁহারা বিনাশ করিতেন আর তৈমুর নিঃশেষ করিতেন। কোথাও বাধা পাইলে অথবা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিলে তিনি সেখানে আর জনমানবের চিহ্ন রাখিতেন না। মড়ার মাথার খুলি দিয়া পাহাড় ও স্তম্ভ নির্মাণ ছিল তাঁহার বাতিক। ইস্পাহানে তিনি গড়িয়া

ছিলেন সত্তর হাজার নরমুণ্ডের পিরামিড। বোগ্‌দাদে নির্মিত হইয়াছিল একশ' কুড়িটি মুণ্ডমিনার। পাঁচদিন ধরিয়া দিল্লী বিধ্বস্ত করিয়া যখন ভস্ম ও কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছুই রহিল না তখন তিনি নরকঙ্কালের স্তম্ভ গড়িলেন, মৃতদেহ শৃগাল ও শকুন দিয়া খাওয়াইলেন। শোনা যায় তুর্ক সুলতান বায়েজিদকে তিনি বন্দী করিয়া পশুর মত খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হইত ইস্‌লাম ধর্মের নামে। কিন্তু তৈমুর কেবল সর্বনাশের খেলাই খেলিয়া গেলেন। তিনি চিঙ্গীজের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না।

১১ তুর্কজাতির পুনরুত্থান ঃ কনস্টান্টিনোপলের পতন

প্রদীপ নিভিবার আগে যেমন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, মোঙ্গল জাতির বিক্রমও ফুরাইবার আগে তেমন তৈমুরের নেতৃত্বে শেষ বিভীষিকা বিস্তার করিয়া গেল। মোঙ্গলদের পথ ধরিয়া আসিল তাতার জাতি। ইহারা তুর্ক মুসলমান।

তের শতকের মাঝামাঝি চিঙ্গীজের আক্রমণে ইহারা তুর্কীস্তান হইতে বিতাড়িত হন। নূতন দেশের সন্ধানে ইহারা কয়েকশত অশ্বারোহী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল আনাটোলিয়ায়, এখন যে জায়গার নাম এশিয়া মাইনর। একদিন পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে তাহারা দেখিল দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ দেখিলেই তুর্ক-রক্ত নাচিয়া ওঠে। কাহারা লড়াই করিতেছে, কেনই বা লড়িতেছে, কিছুই তাহারা জানিত না। তাহারা দেখিল একদল হারিয়া যাইতেছে এবং ইহাদের পক্ষ লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে নামিয়া পড়িল। তাহাদের সহায়তায় এই দলটি জিতিয়া গেল। ইহারা ছিল এক সলজুক তুর্ক সুলতানদের বাহিনী। কৃতজ্ঞ সুলতান দেখিলেন তাঁহার অপরিচিত রক্ষাকর্তারা তাঁহারই জ্ঞাতিভাই। তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বসবাসের জন্য জমি দিলেন। আনাটোলিয়ায় আবার এক তাতার সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইল।

যাযাবর তুর্কনায়কের পুত্র ওসমান হইলেন আনাটোলিয়ার প্রথম স্বাধীন রাজা। সেই হইতে এই অঞ্চলের তুর্কদিগকে বলিত 'ওসমানলি' বা 'অটোমান তুর্ক'।

তখন এশিয়া মাইনরে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ও সলজুক তুর্ক উভয় শক্তিই ম্রিয়মান। সুযোগ বুঝিয়া অটোমান সুলতানরা আশেপাশে উপজাতিগুলিকে বশ করিলেন এবং বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের এশিয়াস্থিত অঞ্চলগুলি দখল করিলেন। তারপর তুর্করা ক্রমে ক্রমে কনস্টান্টিনোপ্‌লকে ঘিরিয়া ঐ সাম্রাজ্যের



তুর্ক যোদ্ধা

ইয়োরোপীয় অঞ্চলগুলিও অধিকার করিল। সাম্রাজ্যের শাসকবর্গের মধ্যেও তখন চরম দুর্নীতি ও দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময়ে তাহারা তুর্কদিগকে সাধিয়া ডাকিয়া আনিত ও সাহায্য করিত। আর তুর্কদের দেহে মনে তারুণ্যের উদ্যম। তাহাদের রাজা ও সেনাপতিরা শক্তিশালী ও রণনিপুণ। তাঁহারা এক পন্থা বাহির করিলেন যাহাতে নিজেদের লোকক্ষয় না করিয়া ইয়োরোপ জয় করা যায়। খ্রীষ্টান বন্দীদের সন্তানদিগকে লইয়া সুলতানরা এক বালসেনা গঠন করিলেন, তারপর খ্রীষ্টান

প্রজাদের নিকট হইতে করের বদলে লইলেন তাহাদের পুত্রসন্তান। আট বছর বয়সে ইহাদিগকে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিতে হইত। তারপর ইহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইত এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখানো হইত। ধর্ম ও যুদ্ধ ছাড়া ইহারা আর কিছু জানিত না। ইহাদিগকে বলিত 'জানিসারি' বা নয়া ফৌজ। অটোমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ইহারা ছিল প্রধান সহায়।

চৌদ্দ শতকের শেষভাগে স্থলতান হইলেন বায়েজিদ। তাঁহার হাতে ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর এক মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইল। বুলগেরিয়ায় নিকোপোলিসের মাঠ হাজার হাজার নাইট ও খ্রীষ্টান সেনার রক্তে রাঙা হইয়া গেল (১৩৬৯)। বায়েজিদ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"রোমের সেণ্ট পীটার গির্জার বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আমার ঘোড়া দানা খাইবে।" এই নৃশংস প্রতিজ্ঞা পূরণের আগে তিনি কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ অবরোধ করিলেন। মহানগরীর উপর গভীর আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল।

এমন সময়ে অটোমান রাজ্যের পশ্চাতে কালান্তক যমের মত আসিয়া হাজির হইলেন তৈমুর লঙ্‌। তুর্ক বাহিনী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ছাড়িয়া তৈমুরের বাহিনীর সম্মুখীন হইল। অঙ্গোরার মাঠ তুর্করক্তে লাল হইল (১৪০২)। বায়েজিদ বন্দী হইলেন এবং তৈমুরের কারাগারে প্রাণ দিলেন।

কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতন ঃ বিশ বছরের মধ্যে তুর্করাজ্যের দেহ হইতে অঙ্গোরার ক্ষত শুকাইয়া গেল। আবার তুর্করা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ আক্রমণ করিল কিন্তু নগরীর সুদৃঢ় প্রাকার ভেদ করিতে পারিল না। শেষে ১৪৫৩ সালে নগরী অবরোধ করিলেন দ্বিতীয় মোহম্মদ। অতুল পরাক্রমের জন্য তাঁহাকে তুর্করা বলিত "মহাবীর"। দেড় লক্ষ সৈন্য ও বিরাট নৌবাহিনী দিয়া তিনি এই

দুর্ভেদ্য নগরীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নগরীর রক্ষণে ছিল মাত্র আট হাজার সৈন্য। দুইমাস লড়িবার পর তুর্করা দুর্গ ভেদ করিল। সম্রাট একাদশ কনস্টেন্টাইন সসৈন্যে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। নগরীর এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে চল্লিশ হাজারকে তুর্করা হত্যা করিল আর পঞ্চাশ হাজারকে দাস বানাইল। পশ্চিম-সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক হাজার বছর পরে পূর্বসাম্রাজ্যের অবসান হইল।

মোহম্মদ বিধ্বস্ত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। জনহীন পুরী ও শূন্য প্রাসাদের দিকে তাকাইয়া মুহূর্তের জন্য তাঁহার ভাবান্তর হইল। সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও বৈভবের ইহাই পরিণতি! বিজয়ী সুলতান ফারসী কবি ফেরদুসির একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন ঃ

> সীজারের রাজপুরীতে আজ পর্দা হয়েছে মাকড়সার জাল,
> আফ্রাসিয়াবের*রক্ষীমিনারে আজ পেচক প্রহরায় রত।

বিজেতারা সেণ্ট সোফিয়ার গির্জাকে মসজিদ বানাইলেন—ক্রুশচিহ্ন সরাইয়া গম্বুজশিখরে স্থাপন করিল অর্ধচন্দ্র। সমস্ত ইয়োরোপ জুড়িয়া ত্রাসের সঞ্চার হইল, বুঝি বা রোমের ভাগ্যেও এই লাঞ্ছনা লেখা আছে, হয়ত সেণ্ট পীটারের গির্জার উপরেও অর্ধচন্দ্র শোভা পাইবে!

ইয়োরোপের ক্ষাত্রশক্তিকে আবার ধর্মযুদ্ধের নামে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের দিন ফুরাইয়া গিয়াছিল। সামন্তপ্রথা ও নাইটদের যুগও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ধর্মের ডাকে ইয়োরোপের আর সাড়া জাগিল না।

মোহম্মদ ইটালীর দক্ষিণে টরেণ্টো নগরী জয় করিলেন। তাহার পর একশ' বছর ধরিয়া অটোমান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ

* আফ্রাসিয়াব পারসীক উপকথার নায়ক শক্তিশালী সম্রাট

করিতে লাগিল। সুলতান সুলেমান আর্মেনিয়া ও মিশর জয় করিলেন। দানিউব নদী পার হইয়া হাঙ্গেরী অধিকার করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করিলেন। এখানে সুলেমানকে প্রথম ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হইল। পোল বীর সোবিস্কার নেতৃত্বে খ্রীষ্টান জগৎ ইস্‌লামের কবল হইতে রক্ষা পাইল।



কিন্তু তুর্কজাতির দেহে তখনও রহিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তাহারা আরও তিনশ' বছর ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গমস্থলে সাম্রাজ্য গড়িয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের সুলতান হইলেন ইস্‌লামের ধর্মগুরু বা খলিফা। জাস্টিনিয়ান ও হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্যভূমি জুড়িয়া প্রসারিত রহিল খলিফার সাম্রাজ্য।

কালক্রম

ইয়োরোপ	পশ্চিম এশিয়া	সাল	সাল	ভারতবর্ষ	বঙ্গদেশ
	গজনীর প্রতিষ্ঠা	৯৬০			পাল বংশ
	সুলতান মামুদ	৯৯৮			
	খারিজম্‌-এর প্রতিষ্ঠা	১০১৭		মামুদের আক্রমণ	
	সলজুক রাজ্য - তুঘ্রিল	১০৩৮–১০৬৩	১০৪০		তিব্বতে দীপঙ্কর
			১০৬৩		
			১০৭৫		কৈবর্ত রাজ্য
ধর্মযুদ্ধ		১০৯৫			
			১১০০		
			১১২০		রামপাল
			১১৭৩		সেন বংশ
	ঘোর রাজ্য - গজনী অধিকার	১১৭৫		মোহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ	
রিচার্ড ও সলাদিন	সলজুক রাজ্য - সলাদিন	১১৯২	১২০৬		বখতিয়ার খলজী
	মোঙ্গল অভ্যুত্থান - চিঙ্গীজ	১২২০		দাস বংশ	
	কুবলাই খাঁ	১২৬০			বাংলার বিদ্রোহ
	অটোমান রাজ্য - ওসমান	১২৯৯	১২৯০	খলজী বংশ	স্বাধীন বঙ্গ
			১৩২০	তুঘলুক বংশ	ইলিয়াস শাহ বংশ
				তৈমুরের আক্রমণ	
তুর্ক সাম্রাজ্য	বায়েজিদ, তৈমুর লঙ্‌	১৩৮০–১৪০২			
			১৪১৩	সৈয়দ বংশ	
কনস্টান্টিনোপলের পতন	দ্বিতীয় মোহম্মদ	১৪৫৩	১৪৫১	লোদী বংশ	হুসেন শাহ বংশ
তুর্ক অধিকারে হাঙ্গারী			১৫২৬	বাবর কর্তৃক দিল্লী জয়	
ভিয়েনায় তুর্কসেনা প্রতিহত	সুলেমান	১৫২৯			
			১৫৭৬		আকবর কর্তৃক বঙ্গজয়

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

২। জার্মান জাতির মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ? রোমানদের সঙ্গে জার্মানদের তুলনা কর।

৩। ভারতবর্ষে হূণ জাতির প্রবেশ ও বসতি স্থাপনের বিবরণ দাও।

৪। হূণরাজ এটিলা ও মিহিরকুলের চরিত্র বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন ? কিসের জন্য ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন ?

২। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যে কোথায় দুর্বলতা ছিল ?

৩। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

১। হর্ষবর্ধন কিরূপে দুই রাজ্যের রাজা হইলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?

২। হিউএন সাং কিরূপে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছিলেন ?

৩। হিউএন সাং-এর ভারত-বিবরণী বর্ণনা কর।

৪। টাং আমলকে কেন চীনের স্বর্ণযুগ বলা হয় ? এই আমলের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় ?

২। প্রাচীন ভারতীয়রা কোথায় কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন ? এই উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতীয়দের কি সম্পর্ক ছিল ?

৩। আংকর ভাট ও বোরোবুদুরের বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। আরব জাতি সম্বন্ধে কি জান?

২। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক কে? এই ধর্মের সার কথা কি?

৩। আরবদের দিগ্বিজয় সম্ভব হইয়াছিল কি কি কারণে? খ্রীষ্টান ইয়োরোপ কিরূপে ইসলামের হাত হইতে বাঁচিল?

৪। ইস্‌লামের প্রথম চারিজন ধর্মগুরু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। সংক্ষেপে আলোচনা কর—সিয়া ও সুন্নী, হারুণ-অল রশিদ, হুনাইন ইবন ইশাক, মুসলিম স্পেনের স্থাপত্য।

৬। পৃথিবীর সভ্যতায় আরবদের অবদান কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শার্লামেনের চেহারা ও চরিত্র বর্ণনা কর।

২। শার্লামেন ইতিহাসে কেন চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন?

সপ্তম অধ্যায়

১। সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয় কিরূপে? সামন্তদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি আলোচনা কর।

২। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় গ্রামের ও শহরের জীবন কিরূপ ছিল?

৩। সংক্ষেপে আলোচনা কর:—মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় মঠ ও চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, রিচার্ড ও সলাদিন।

৪। ধর্মযুদ্ধের কারণ কি? ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। সুলতানী আমলের সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

২। আরব ও তুর্কদের ভারত-অভিযান সম্বন্ধে কি জান ?

৩। দিল্লীতে প্রথম মুসলিম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন কে ? তাঁহার বংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৪। খল্‌জী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতানের জীবন আলোচনা কর।

৫। মোহম্মদ্ বিন্ তুঘ্‌লুকের খামখেয়ালীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। সুলতানী আমলের সাধুসন্তদের ধর্মকথা বর্ণনা কর। ইহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্মকথার পার্থক্য কোথায় ?

নবম অধ্যায়

১। সারা বাংলার প্রথম স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজা কে ছিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?

২। ধর্মপাল সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৩। বাংলার সেনবংশের বিবরণ দাও।

৪। পাল ও সেন আমলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। অতীশ দীপঙ্করের জীবনী লিখ।

৬। পাল ও সেন আমলের সমাজ-জীবন আলোচনা কর।

৭। বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ? তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কি ?

৮। চৈতন্যদেবের ধর্মের বিশেষত্ব কি ? এই ধর্ম কিসের জোরে প্রচারিত হইয়াছিল ? বর্তমান কালে চৈতন্যদেবের ধর্মের কি প্রভাব দেখিতে পাও ?

দশম অধ্যায়

১। মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ? তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। চিঙ্গীজ খাঁর মন্ত্রী কে ছিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। কুব্‌লাই খাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? পোলোগণ কোথা হইতে কেমন করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন এবং কোন পথে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন?

৪। চীনদেশ সম্বন্ধে মার্কো পোলো কি বিবরণ দিয়াছেন?

৫। তৈমুরলঙ্‌-এর নিষ্ঠুরতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। তৈমুর ও চিঙ্গীজ খাঁর তুলনামূলক আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

১। অটোমান তুর্ক কাহাদিগকে বলে? কেমন করিয়া তাহারা রাজ্য গঠন করিল?

২। কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতনের কারণ কি? অটোমান তুর্কদের সামরিক শক্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

৩। সংক্ষেপে পরিচয় দাও :—নয়া ফৌজ বা জানিসারি, বায়েজিদ, দ্বিতীয় মোহম্মদ।